"ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার ও তাঁর ইতিহাস দর্শন"

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. (ইতিহাস)

উপাধির জন্য প্রদত্ত – গবেষণা সন্দর্ভ

শ্রাবনী মন্ডল

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৬-২০১৯

ক্রমিক সংখ্যা (শ্রেণী) – ১০১৬০০৬০৩০১৩

ক্রমিক সংখ্যা (পরীক্ষা সংক্রান্ত) – MPHFHI1903

রেজিস্ট্রেশন নং – ১৩৮৫৩০ (২০১৬ – ২০১৭)

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

CERTIFICATE

Date : 14/05/2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that the dissertation titled "ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার ও তাঁর ইতিহাস দর্শন" being submitted by Ms. Srabani Mondal has been written under my guidance and supervision during 2017-2019.

This dissertation is approved for the submission towards the partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Philosophy, in the faculty of Arts, Jadavpur University.

14/5/19

Supervisor
Subhasis Biswas
Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata 700032

Professor
Department of History
Jadavpur University
kolkata-700 032

14.5.19

Head of the Department
Department of History
Jadavpur University
Kolkata 700032

Head
Department of History
Jadavpur University
Kolkata- 700 032

DECLARATION

I, Ms, Srabani Mondal, Roll Number- .M.P.H.F.HI.19.03.. do hereby declare that the dissertation titled "ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার ও তাঁর ইতিহাস দর্শন" submitted by me in order to fulfill the partial requirement for the degree of Master of Philosophy (M.Phil.) in History at Jadavpur University, session 2016-2019.

This work is original and no part of it is submitted anywhere else for any other degree or diploma.

Srabani Mondal
(Signature of the Student)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল গবেষণা প্রসঙ্গে আমার বর্তমান গবেষণাটির অবতারণা। উক্ত গবেষণাটি সম্পূর্ণ রূপদান করার ক্ষেত্রে একাধিক মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে, যাঁদের সাহায্য না পেলে এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি কখনোই সম্পূর্ণ হত না।

প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে, যারা আমাকে এই গবেষণা কার্যটি করার সুযোগ করে দিয়েছেন। প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ডঃ শুভাশিষ বিশ্বাস মহাশয়কে। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে তাঁর তত্ত্বাবধান, উৎসাহ ও সহযোগিতা আমাকে সবসময় সঠিক দিক নির্দেশ করেছে। একইসাথে আমি ধন্যবাদ জানাই ডঃ মহুয়া সরকার মহাশয়াকে। তাঁর উপদেশ, সহায়তা ও সুপরামর্শ আমাকে গবেষণা পত্রটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রধান প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। উভয়েই শত ব্যস্ততার মধ্যেও যেভাবে সর্বদা আমার গবেষণা পত্রটিকে সম্পূর্ণ করতে প্রেরণা দিয়েছেন, তাতে আমি নিঃসন্দেহে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁদের সান্নিধ্যে আমার এই গবেষণা পত্রটি সম্পূর্ণ করতে পেরে আমি প্রকৃতই কৃতজ্ঞ। এই উপলক্ষে তাঁদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রনাম নিবেদন করি।

এরপর আমি কৃতজ্ঞতা ও প্রনাম জানাই আমার ইতিহাস বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দকে, যাঁদের কাছে আমি বিভিন্ন সময় নানান সহায়তা ও পরামর্শ পেয়েছি। পাশাপাশি বিভাগীয় গ্রন্থাগারের প্রধান আধিকারিক বনানী রায় এবং জয়শ্রী চৌধুরী দিদিকেও ধন্যবাদ। যাঁরা বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ দিয়ে এই গবেষণাটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন।

পাশাপাশি অন্যান্য একাধিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে আমি অবর্ণনীয় সহযোগিতা লাভ করেছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার, দ্য রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ – এই সব প্রতিষ্ঠানের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

এই গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে আমাকে সহায়তা করার জন্য আমি আরও কয়েকজনকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইব। এছাড়াও ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের কয়েকজন গবেষক ও গবেষিকাকে, যথা- শুভঙ্কর দে, প্রসেনজিৎ দাস, অমিয় বাগাল, মৌসুমি পাল,সায়নী রায়, শ্রাবন্তী কর্মকার সহ আরও অনেককে, যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমার পাশে থেকেছেন গবেষণা প্রকল্পটি তৈরীর ক্ষেত্রে।

আমি আন্তরিক প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানাই আমার পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে যাঁদের আশীর্বাদ, সহযোগিতা, বিশ্বাস ও অনুপ্রেরণা না থাকলে আমার পক্ষে এই গবেষণা করা সম্ভব হত না। প্রথমেই আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই আমার মা ও বাবাকে, যাঁদের সাহায্য ও অনুপ্রেরণা আমাকে সর্বদা আমার লক্ষ্যপূরণকরতে সাহায্য করেছে। আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতিও আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ সেই সব মানুষের প্রতি যাঁরা কোনরকম স্বীকৃতি ছাড়াই আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। সেই সমস্ত মানুষকে যথাযোগ্য স্থানে আমি যথাযোগ্য স্থানে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই।

শ্রাবণী মন্ডল

এম. ফিল গবেষিকা

ইতিহাসবিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১)	সূচনা	১-৬
২)	সুশোভন সরকারঃ প্রথম জীবন	৭-১৬
৩)	সুশোভন সরকারঃ শিক্ষক জীবন	১৭- ৩৬
৪)	ইতিহাসে সুশোভন সরকারের অবদান	৩৭- ৮৭
৫)	ঐতিহাসিক রূপে সুশোভন সরকারের অবদান	৮৮- ৯৩
৬)	উপসংহার	৯৪- ৯৫
৭)	গ্রন্থপঞ্জী	৯৬

সূচনা

ইতিহাস লেখনির ধারা বিভিন্ন সময়ে সমৃদ্ধ হয়েছে সংগৃহীত তথ্যসূত্র ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষনের মাধ্যমে। ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা যেমন বিষয়বস্তুরূপে ইতিহাসকে প্রাঞ্জল করে তোলে তেমনি গিবেষনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করে। বিভিন্ন সময়ে ঐতিহাসিকগন তাদের ইতিহাস দর্শন প্রতিফলিত করেছে নিজস্ব রচনায়, ডঃ সুশোভন সরকার ছিলেন এমনই একজন ব্যাক্তিত্ব যার রচনাশৈলী ইতিহাসকে করেছে আরও সমৃদ্ধ।

সুশোভন সরকার বিদেশ থেকে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ফিরে আসেন। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন লেকচারার হিসাবে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন ও ইতিহাস বিষয়ে ভাবনা চিন্তা লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। এর আগে তিনি বিভিন্ন কাজে যেমন বিশ্বভারতীর সাংগঠনিক কাজে যুক্ত ছিলেন। সেখানে তিনি ছাত্রদের বিজ্ঞান ও কলা শাখায় পঠন পাঠনে উৎসাহিত করতেন। তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নিযুক্ত হন। তিনি মার্কসবাদী ও গ্রামশির ভাবধারায় প্রভাবিত ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতাকালীন তিনি ‘পরিচয়’ দলে যোগদান করেন। এই সময় তিনি ছাত্র সমাজকে অধ্যাপনার কাজে উৎসাহিত করতে থাকেন। এই সময়েই তিনি ইংরেজী বিষয়ের অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সরকারের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রকাশ করেন “ Presidency College Centenery Volume” এখানে তিনি বাংলার নবজাগরন ও ডিরোজিওর ভূমিকাকে তুলে ধরেন।

তার রচনাশৈলির প্রকাশ বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে "বাংলার রেনেসাঁস" গ্রন্থে। তিনি এখানে দেখিয়েছেন উনিশ শতকীয় সমাজে বাংলা ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বেশি পরিবর্তীত হয়েছিল। বর্তমান সমাজের যা সুফল দেখা জায় তা উনিশ শতকীয় নবজাগরনের ফল। তিনি তার বিভিন্ন রচনায় মার্কসীয় দর্শন, ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে তুলে ধরেছেন।

পুস্তক পর্যালোচনা

সুশোভন সরাকে নিয়ে গবেষনা আজ পর্যন্ত হয়নি, ফলে লেখালেখির আধিক্য কম। ১৯৭৬ সালে পিপ্‌ল পাবলিকেশন হাউস থেকে থেকে "Essay in Hnour of Sushobhan Sarkar" গ্রন্থটি সুশোভন সরকার স্মরনে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে অধ্যাপক বরুন দে তাঁর সম্পর্কিত কিছু স্মৃতি, শিক্ষকতা জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থেই পি সি জোশী "একজন প্রিয় শিক্ষক" স্মরনে কিছু রাজনৈতিক স্মৃতি তুলে ধরেছেন।

অধ্যাপক বরুন দে সুশোভন সরকারের প্রথম জীবন,শিক্ষকতা জীবন ও কিছু ব্যাক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তার লেখাপত্রগুলিকে বিশ্লেষন করে একজন ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন তা আলোচনা হয়নি। একইসঙ্গে পি সি জোশীও তাঁর নিজের ব্যাক্তিগত জীবনে প্রফেসর সরকার কিভাবে জড়িয়ে ছিলেন তা আলোচনা

করেছেন কিন্তু একজন ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন বা তার লেখালেখির প্রভাব কেমন ছিল, বা তার লিখনশৈলী কেমন ছিল সে বিষয়ে আলোচনা হয়নি।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ থেকে প্রকাশিত-"সাহিত্য সমাজ ইতিহাস, সুশোভন সরকার স্মারক বক্তৃতা সংকলন ১৯৯৬-২০১৬" থেকে সুশোভন সরকার সম্বন্ধে জানা জায়। এখানে বরুন দে-র লেখা যা মূলত ইংরেজি লেখার বাংলা অনুবাদ ও বাংলার নবজাগরন প্রসঙ্গে অলোক রায় এর লেখা থেকে তাঁর সম্পর্কে জানা জায়।

এখানে লেখকগন একইভাবে সুশোভন সরকার কে নিয়ে অর্থাৎ ব্যাক্তি হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলার নবজাগরন সম্পর্কে অল্পবিস্তর লেখা হলেও অন্যান্য লেখাগুলি ন্যে আলোচনা হয়নি।

গবেষনার বিষয়বস্তু

উক্ত গ্রন্থগুলিতে সুশোভন সরকার একজন ব্যাক্তি হিসাবে কেমন ছিলেন তা বিশ্লেষন করা হয়েছে, কিন্তু একজন ঐতিহাসিক হিসাবে ইতিহাসে তাঁর অবদান তাঁর চিন্তাধারা, লিখনশৈলী, তাঁর আত্ম –স্মৃতি এগুলিকে আলোচনা করা হয়নি। আলোচ্য গবেষনা পত্রে এই

বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। সমসাময়িক সময়ে ওইতিহাসিক হিসাবে কতটা অগ্রগন্য ছিলেন তা এই গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয়।

তথ্য সংগ্রহ

আলোচ্য গবেষনা পত্রে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত উপাদানগুলিকে ব্যাবহার করা হয়েছে তা হল-

১) সুশোভন সরকারের নিজস্ব লেখা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ।

২) পরিচয় পত্রিকা থেকে প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহ।

৩) শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ সম্পাদিত " পরিচয়ের আড্ডা" ইত্যাদি

দ্বিতীয় উপাদান গুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য দের কিছু বক্তব্য, অন্তর্জাল মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন

আলোচ্য গবেষনা পত্রটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত-

প্রথম অধ্যায়ঃ সুশোভন সরকার- প্রথম জীবন

এখানে তাঁর জন্ম থেকে শুরু করে শিক্ষকতা জীবনে প্রবেশ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সুশোভন সরকার- শিক্ষক জীবন

এই অধ্যায়ে তাঁর শিক্ষক জীবন নিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করা ও সে সময়ে অন্যান্য স্বাধীন স্বত্ত্বাগুলিকে আলোচন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ইতিহাসে সুশোভন সরকারের অবদান

এই অধ্যায়ে তাঁর লেখা গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলিকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ঐতিহাসিক রূপে সুশোভন সরকার

তাঁর লেখাগুলিকে বিশ্লেষন করে ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ উপসংহার

এইভাবে ধীরে ধীরে অধ্যাপক সুশোভন সরকার ও তার ইতিহাস দর্শন কে আলোচনা করা হয়েছে।

সুশোভন সরকারঃ প্রথম জীবন

ইতিহাস ও ঐতিহাসিক শব্দ দুটির গভীরতা না পরিমাপযোগ্য না বিশ্লেষিত, উভয়ের সীমারেখা বিস্তৃত পরিসরে ব্যাপ্তৃত রয়েছে। ইতিহাসের স্বরূপ, তার বিস্তীর্ন ক্ষেত্রের বিচারভিত্তিক বিশ্লেষন ঐতিহাসিক কলমের মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে ওঠে পাঠকের অন্তরে। অধ্যাপক সুশোভন সরকার ছিলেন এমনই একজন ব্যাক্তিত্ব, যাঁর ইতিহাসে অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন। উনিশ শতকীয় বাংলা তথা বিশ্বের ইতিহাস তাঁর বিশ্লেষনের মাধ্যমে হয়ে ওঠে সজীব ও প্রানবন্ত। বিংশ শতকীয় ভারতে ইতিহাস শিক্ষকরূপে সুশোভন সরকার ছিলেন একজন অনন্য ব্যাক্তত্ব যাঁর ইতিহাস বিষয়ক সচেতনতা তাঁর শিক্ষার্থী তথা সমগ্র ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কয়েক প্রজন্ম সময়ে প্রবহমান।

আধুনিক ইউরোপ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ সাংবিধানিক ইতিহাস বিকাশের সামাজিক প্রেক্ষিত এবং পশ্চিম ইউরোপীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারার ওপর এবং তাঁর কর্মজীবনের পরের দিকে এসে উনিশ ও বিশ শতকের গোড়ার দিকের ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নবজাগ্রত সংস্কৃতির ওপর জোর দিয়েছেন। মানব বিকাশের ধারার বিশ্লেষনে তিনি মার্কসীয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা ও তার প্রয়োগ করে সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে চিন্তাচেতনার ও প্রভাবশালী ঘটনাবলীর ঘাতপ্রতিঘাতকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস পাঠকবর্গকে

করেছে আপ্লুত ও সচেতন। তিনি ছিলেন একজন নিয়মানুবর্তী এবং স্বচ্ছদৃষ্টীর অধিকারী ব্যাক্তি, যিনি ভারতের কমিউনিস্ট দলের গোড়াপত্তনের সময় থেকে ছিলেন একজন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সুহৃদ।[১]

১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ১৯ আগস্ট অধুনা বাংলাদেশের ঢাকায় (পশ্চিমবঙ্গের কোঁটাই অঞ্চলে) একটি ব্রাহ্মন পরবারে সুশোভন সরকার জন্মগ্রহন করেন। বাবা সুরেশ্চন্দ্র সরকার ছিলেন হিস্টোরিক্যাল স্টাডিস এর সরকারী চাকুরিজীবী এবং বড়দাদা সুবিমল সরকার ছিলেন পাটনা কলেজের ইতিহাস বিষয়ের অধ্যাপক। সেখান থেকেই তাঁর মধ্যে ইতিহাস বিষয়ের প্রতি মমত্ববোধ তৈরি হয়।[২] অধ্যাপক সরকারের বিদ্যালয় জীবন সম্পূর্ণ হয় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে (১৯০৫-১৭)। ১৯১৭-১৯২১ খ্রীঃ তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে ৪ বছরের স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২৩ খ্রীঃ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ সম্পূর্ণ করেন। দুটি স্তরেই সরকার প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

[১] De Barun, Sushovan Sarkar: (1900-1982) : "A Personal Memoire",(Transleted- সাহিত্য সমাজ ইতিহাসঃ সুশোভন সরকার স্মারক বক্তৃতা (১৯৯৬- ২০১৬), পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, পৃ-৪১৯।

[২] Essay in Honour Of Sushovan sarkar, People Publication House, new delhi,1976.

বিহারে প্রথম জীবনের কিছু স্মৃতিঃ

সুশোভন সরকার তাঁর ব্যাক্তিজীবনের কিছু মুহুর্ত স্মরন করতে গিয়ে বিহারে কাটানো জীবনের বিশেষ দিনগুলিকে ব্যাক্ত করেছেন। ঢাকা তাঁর জন্মস্থান হলেও বিহারে কাটানো দিনগুলি ছিল তার জীবনে অনেক বেশী মর্মস্পর্শী। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মুজফফরপুর অঞ্চলে তিনি ওতাঁর পরিবার বাস করতেন। নদী তীরবর্তী জনাকীর্ন মুক্ত পরিবেশে তিনি থাকতেন। পরবর্তী সময়ে এর কেন্দ্রে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিহারের সঙ্গে তাঁর পরিবারের সরাসরি যোগ ছিল কারন তাঁর বড় দাদা পাটনা কলেজে অধ্যাপনা করতেন এবং সেখানেই তিনি মারা গিয়েছিলেন।

শিক্ষাজীবনঃ

কলকাতার শিক্ষিত সমাজ যাকে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র বলে গন্য করে সুশভন সরকার সেভাবেই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেন। ইতিহাসে বি এ অনার্স এবং এম এ দুটি শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার সর্বচ্চো সম্মানলাভের দুর্দান্ত কৃতিত্ব তিনি অর্জন করার পর একই বিষয়ে অক্সফোর্ড থেকে অনার্স ডিগ্রি নিয়ে ভালভাবে উত্তীর্ন হন। যে বিষয়টি সমগ্র পাঠককূলের দৃষ্টিগোচর হয়নি তা হল কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হিসাবে তাঁর ভাবমূর্তি একজন লাজুক, বইমুখো বিদ্যার্থী

হিসাবে গড়ে উঠলেও, তিনি সামাজিক কাজকর্মে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন এবং প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের নেতৃত্বে একদল যুবককে সঙ্গে নিয়ে "ভাতৃসংঘ" গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকার কথা লিখে গেছেন। যার পাঠচক্র , কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে উত্তর কলকাতার গনতান্ত্রিক এবং সংস্কারমুখী সাধারন ব্রাহ্মসমাজের নিদ্রিত গোষ্ঠীতান্ত্রিক চেতনায় ঘা দিয়ে সচেতন করে গড়ে তুলতে উৎসাহী ছিলেন।

কলকাতায় সুশোভন সরকারের ছাত্রাবস্থার বছরগুলো(১৯১৭-২৩) কাটানো সময়গুলি তিনি একটি ডায়ারিতে লিখতেন- যার কথা তাঁর ছেলে সুমিত সরকার তার মৃত্যুর পর উল্লেখ করেছেন। সেখনে দেখা যায় যে কিভাবে অসহযোগ আন্দোলন তথা যুদ্ধোত্তর পর্বে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গনজাগরনের দ্বারা তাঁর জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। মনেপ্রানে একজন জাতীয়তাবাদী হিসাবে তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিঙ্গুলি পর্যন্ত সাধারন মানুষের মধ্যে নিজেকে স্তান দিতে, তাদের সামাজিক চেতনা উদ্বেলিত করতে এবং মানুষের মনে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের আদর্শকে গভীরভাবে নিয়োজিত করতে তৎপর ছিলেন।

সুশোভন সরকার যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন তখন একজন ভালো ছাত্র হিসাবেই তিনি শিক্ষক ও ছাত্র মহলে পরিচিত ছিলেন। পূর্বেই উল্লেখিত যে তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি 'সীতা দেবী বিল্ডিং' এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সামাজিক সংস্থাটি ১৯২০ খ্রীঃ সাধারন সমাজের নির্বাচিত সদস্য রূপে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মনোনীত করতে এবং একইসঙ্গে স্থায়ী সদস্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে সুশভন সরকার পরে অধ্যক্ষের দায়িত্বভার অর্পন করেন। রামচন্দ্র চ্যাটার্জী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, গীরিন্দ্রশেখর বোস, এমনকি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সভায় যোগ দিতেন। এখানে বিভিন্ন নথীপত্র পড়া আলোচনা চলত যা ছিল মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়ক।[৩]

সুশোভন সরকার অক্সফোর্ডের 'জেসাস কলেজ' এর দুবছর(১৯২৩-২৫) প্রেসিডেন্সি কলেজের মতোই একজন মেধাবী চাত্র ছিলেন। তিনি সে সময় সেখানকার কিছু স্মৃতি তুলে ধরেছেন।যেমন তিনি জে জি এডওয়ার্ড এর নাম উল্লেখ করেছেন, যিনি পরবর্তীকালে "ইংলিশ হিস্টোরিক্যাল রিভিউ" এর সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বক্তব্য সরকারের মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। একঈভাবে সি টি অ্যাটকিনসন এর কথাও তুলে ধরেছেন।

অক্সফোর্ডে থাকাকালীন তিনি সেখানকার শিক্ষকগনের নাম ও একইসঙ্গে বন্ধুদের নাম স্মরন করেছেন, যারা তার আজীবন পথসঙ্গী ছিলেন। যেমন শচীন চৌধুরী যিনি একজিন ব্যারিস্টার ও ব্যাবসায়ী ছিলেন, তিনি সরকারের আজীবন বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। একইসঙ্গে অন্ধ্রের ছাত্র গোপালাস্বামী, বাকর আলি যিনি পরবর্তী সময়ে পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন-

[৩] Essay in Honour Of Sushovan sarkar, People Publication House, new delhi,1976.

এঁরা সরকারের জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। আজীবন তাঁরা সরকারের পাশে থেকে তাঁকে সহযোগীতা করেছিলেন। [৪]

মনেপ্রাণে একজন জাতীয়তাবাদী হিসাবে তিনি জীবনের শেষ দিনগুলি পর্যন্ত ভারতের মানুষের মধ্যে ঐক্যের আদর্শকে তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন। একইভাবে তিনি অনুপ্রাণিথয়েছিলেন সোভিয়েত বিপ্লবের প্রতি। অক্সফোর্ডের জেসাস কলেজে কাটানো দুবছরের শেষ সময়ে CPGB(Communist Party of Great Britain) ট্যালেন্ট স্কাউট তাঁকে একজন সোস্যালিস্ট হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। ১৯২৫ সালের গ্রীষ্মকালীন টার্ম শেষের পর তিনি ভারতীয় রাজনীতিবর্গের রাজনৈতিক মতাদর্শকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষন করতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি যখন শিক্ষক পদ গ্রহন করেন, সেই সময়ে ইউরোপীয় ইতিহাসের প্রতি তাঁর বিশ্লেষনী বক্তব্য ও যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত।

প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ইতিহাস বিভাগে (১৯২৫-২৭), তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রফেসর(১৯২৭-৩২),তারপর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের প্রফেসর এবং পদাধিকার বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার(১৯৩২-১৯৫৬) পরেযাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর এবং প্রথম বিভাগীয় প্রধান(১৯৫৬-৬১)

[৪] Essay in Honour Of Sushovan sarkar, People Publication House, new delhi,1976.

হিসাবে যোগ দেন। শেষে প্রখ্যাত গবেষকদের জন্য ভারত সরকারের এক বিশেষ প্রকল্পের আওতায় পুনরায় নিযুক্ত হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন।

সুশোভন সরকার ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুশোভন সরকার তাঁর শৈশব জীবনের কিছু স্মৃতি উল্লেখ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মূল্যবান তথ্য উপস্থাপনা করেছেন। ১৯০৪ খ্রীঃ যখন সরকারের বয়স চার তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছিলেন গিরিডিতে, বারগান্ডায় তাঁর বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে। তিনি তাঁর দাদামশায়ের হাত ধরে সেখানে গিয়েছিলেন,যেখানে উপস্থাপিত একটি সভায় রবী ঠাকুরকে কেন্দ্র করে সকলে মেতে ওঠেছিল।

সুশোভন সরকার তাঁর বাবার কর্মসূত্রে ১৯০৭-১৯১২ খ্রীঃ সময়কাল রাঁচীতে কাটিয়েছিলেন, সেখানকার কিছু স্মৃতি তিনি তুলে ধরেছেন। ছোটোবেলায় তা৬র মধ্যে নাটকে অভিনয় করার প্রবনতা ছিল, তাই তিনি ও তার সমবয়সী সকল ছোটোরা মিলে রবী ঠাকুরের একটি নাটক “শারদৎসব” অভিনয় করবেন বলে স্থীর করেছিলেন। তিনি ওই নাটকে ঠাকুরদার ভূমিকায় থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেশ পর্যন্ত নাটকটি অভিনীত হয়নি। ধীরে ধীরে তাঁর পরিবারে রাবিন্দ্রীক প্রভাব বাড়তে থাকে।

সরকারের বাবা নানারকম পত্র পত্রিকা কিনতেন- ‘প্রবাসী’, রবীন্দ্রনাথের আমলের ‘বঙ্গদর্শন’ পরে ‘সবুজপত্র’ ইত্যাদি। এই পত্র পত্রিকার বেশিরভাগ এবং আরো নানা রকম বই সরকারের বারগান্ডার বাড়িতে সঞ্চিত হয়েছিল। যেগুলি বরতমানে হারিয়ে গেছে। এসব পত্রিকা থেকে রবী ঠাকুরের অনেক লেখা তিনি পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার তাঁর বারীতে এসেছিলেন তিনি মুগ্ধ হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন , আর ভাবছিলেন ইনি রবী ঠাকুরের ন দাদা।

সুশোভন সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এসেছিলেন ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে। এই সময়কার বিস্তারিত তথ্য তিনি একটি ডায়ারিতে লিখেছিলেন যেটি বর্তমানে হারিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয় ১৯১৮ সালে একদিন দাক্তার নীলরতন সরকারের ৬১ নং হ্যারিসন রোডের বাড়িতে ওপ্র থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন আর রবীন্দ্রনাথ উঠছিলেন, তখনী উভয়ের পরিচয় ঘটে। ১৯১৮ সালেই তিনি প্রথম শান্তিনিকেতনে যান, সেখানে রবী ঠাকুরকে ঠাকুদার ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় সরকার তখনকার তরুন ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আন্দোলনের নেতা সুকুমার রায়, যাকে তিনি ‘তাতাদা’ বলে ডাকতেন। এই আন্দোলনের নেতারা একটি সংস্কারক সমিতি গড়ে তোলে যেখানে সরকারকে সভ্য করা হয়েছিল।

সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র সমাজের সনাতন নিয়মাবলী পরিবর্তন করে অন্য উদারতর রূপ দেওয়া।

ছাত্র সমাজ পুনর্গঠিত হলে তার কতকগুলি সংলগ্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যেগুলির নাম দেওয়া হয় ফ্রেটারনীতি। এদের মধ্যে অন্যতম হল সোস্যাল ফ্রেটারনীতি। সীতা দেবী ছিলেন এর সেক্রেটারি। সুশোভন সরকার ছিলেন তার সহযোগী। সংস্থার তরফ থেকে আসিক চাঁদা আদায়ের দায়িত্ব সরকারকে দেওয়া হয়েছিল। বৈঠকের স্থান ছিল প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরির বাড়ীর ছাদে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছিলেন ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে। ১৯২১ খ্রীঃ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা হয় এবং এর কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় প্রথম কলকাতায় স্থাপিত হয়। সম্মিলনীর ব্যাবস্থায় রামমোহন রায় মাঝেমাঝে আসতেন যা সরকারের স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

১৯২২ খ্রীঃ প্রশান্তচন্দ্রের ছোট বোন রেবা (বাবলি) ও সুশোভন সরকারের বিবাহ স্থীর হয়। বাবলি বিশ্বভারতীর ছাত্র হিসাবে যোগ দেওয়ার ফলে শান্তিনিকেতনের অনেক কথা জানতে পারতেন। ১৯২৩-২৫ সরকার অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেছিলেন। একটি ছোট্ট ঘটনা তিনি তুলে ধরেন। উত্তর ওয়েলস্ এর সমুদ্রতটে ১৯২৪ এড় গ্রীষ্মের কিছুটা অবকাশ কাটাতে গিয়েছিলেন। যে বাড়িতে তিনি উঠেছিলেন সে বাড়ির গৃহকতৃ বুঝতে পারেননি তিনি ভারতীয়, ফিরে আসার সময় তিনি বলেন-“ আমার মা জীবনে কখনও কোনো ভারতীয় দেখেননি আপনি কি একবার তাঁকে দেখা দিয়ে যাবেন”। প্রফেসর সরকার গেলেন কিচুক্ষন কথাবার্তার পর

তিনি একটি খাতাতে বাংলা ভাষায় রবী ঠাকুরের একখানি কবিতা অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। তারপর ১৯২৪ খ্রীঃ তিনি দেশে ফিরে আসেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগে যোগ দেন। [৫]

[৫] সরকার সুশোভন, "প্রসঙ্গ ইতিহাস", আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুন-১৯৮৩।

সুশোভন সরকারঃ শিক্ষক জীবন

১৯২৩-২৫ খ্রিষ্টাব্দ সময় পর্যন্ত সুশোভন সরকার অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৩ খ্রীঃ দেশে ফিরে সরাসরি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে ইতিহাস শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেন। সুশোভন সরকার তাঁর শিক্ষক জীবনে শুধুমাত্র শিক্ষাদান করেননি, তিনি নিজেকে অন্যান্য কাজে নিযুক্ত রেখেছিলেন। 1926 খ্রীঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে সরাসরি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম সমিতির (Karma Samiti) সদস্য নিযুক্ত করেন। বিশ্বভারতী এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় না থাকলেও বাংলা ও অন্যান্য ভাষার শিক্ষাদানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ন প্রতিষ্টান রূপে গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যে প্রক্রিয়ার অংশ, তার সামাজিক পরিস্থিতি এবং চিন্তাচেতনার দিক নিদের্শক ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে এবং তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মনে কালানুক্রমিক বিবরনী ও গুরুত্বপূর্ন নামগুলিকে গেঁথে দিয়ে অধ্যাপক সরকার উনিশ শতকের হুইগ ইতিহাসবিদ বিউরি বা গ্রোট এর মতই প্রগতির অগ্রগমনকে তুলে ধরতেন। বস্তুত তিনি এক উদারবাদী গনতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করেছিলেন, যাকে প্রায়শই ভিক্টোরিয় বিশেষনে ভূষিত করা হয়। এর বেশিরভাগটাই তিনি পেয়েছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন মহান শিক্ষক কুরুভিল্লা জাকারিয়ার কাছ থেকে, যিনি সরকারকে অনুপ্রানিত করেছিলেন। হিরেন্দ্রনাথ মুখার্জী এবং বিমলা প্রসাদ মুখার্জী যারা সরকারের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন, তারা পরবর্তীকালে রিপন কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা সরকারের বক্ত্যবের দ্বারা বিশেষভাবে আদর্শায়িত হয়েছিলেন।[১]

[১] De Barun, Sushovan Sarkar: (1900-1982) : "A Personal Memoire",(Transleted- সাহিত্য সমাজ ইতিহাসঃ সুশোভন সরকার স্মারক বক্তৃতা (১৯৯৬- ২০১৬), পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, পৃ-৪১৯।

১৯২৯ খ্রীঃ সুশোভন সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার নিযুক্ত হন। সেখানে যারা তাঁর সহযোগী ছিলেন যেমন ভূপেশ্চন্দ্র মুখার্জী, আব্দুল ওয়াহাব মেহমুদ প্রমুখ। এরা প্রফেসর সরকারের ইতিহাস শিক্ষন পদ্ধতির ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ কায়েম করে। এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, যার সঙ্গে সরকারের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একইসঙ্গে পদার্থবিদ্যার শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ট হয়ে পড়েন। এর কিছু সময় পূর্বে তিনি "Parichay" দলে যোগদান করেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত,গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, নীরেন রায়, প্রবোধ বাগচী, চারু দত্ত প্রমুখ ব্যাক্তিবর্গ এই দলের সদস্য ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই সময় Indian Historical Record Commission এর বার্ষিক সম্মেলনে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার। প্রফেসর সত্যেন বোস বিশ্ববিদ্যাল্যের তরফ থেকে যে নামটি প্রস্তাব করেন তা হল প্রফেসর সুশোভন সরকার। সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ইতিহাসবিদদের গবেষনাপত্র নিয়ে আলাপ আলোচনা। সেখানে সরকার তাঁর গবেষনাপত্র পেশ করেছিলেন। সরকারের গবেষনার বিষয়বস্তু ছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে স্বাধীন বাংলা ও তার উত্তর পূর্ব দেশ নেপাল, তীব্বত, ভুটান,বার্মা এবং সিয়াম প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বানিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন। সুশোভন সরকার তাঁর নিজস্ব ৬ টি গবেষনাপত্র রচনা করেছিলেন,যার মধ্যে ৪ টি তিনি " Bengal Past and Present" পত্রিকায় পেশ করেন, ৫ নং পেপার তিনি নিজেই প্রকাশ করেন

(1931-32) এবং ৬ নং পেপার তিনি Indian History Congress এর কলকাতা সমাবেশে পেশ করেন। সরকারের গবেষনাপত্র ছিল সেই সময়ে প্রকাশিত একমাত্র গবেষনাপত্র যেখানে সঠিক ইতিহাস পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপযুক্ত মানদন্ড নির্ধারিত হয়েছিল।[1]

১৯৩৩ খ্রীঃ সুশোভন সরকার পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস শিক্ষক রূপে যোগদান করেন। খুব শীঘ্রই স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যক্ষ পদে সম্মানিত হন। প্রফেসর সুশোভন সরকার শিক্ষনের ক্ষেত্রে ইউরোপ, ব্রিটিশ সাংবিধানিক ইতিহাস এবং রাজনৈতিক চিন্তার ওপর বিশেষত্ব দিয়েছিলেন। এর কিছু সময় পূর্বে তিনি "Parichay" দলে যোগদান করেছিলেন। এই দলের সদস্যরা একে অন্যের বাড়িতে সাক্ষাৎ করতেন। এবং বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা চালাতেন। একইসঙ্গে তাঁরা বিভিন্ন ভাষায় যেমন ইউরোপীয়ান, ইংরেজী এবং বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পুস্তক বিষয়ে আলোচনা করতেন। 'Parichay' পত্রিকায় সুশোভন সরকার তাঁর লেখা অনুচ্ছেদগুলি বিভিন্ন ছদ্মনামে প্রকাশ করতেন, যেমন "বিজন রায়", এবং পরে "অমিত সেন" প্রভৃতি নামে। 1931 সাল থেকে এই প্রবনতা চলতে থাকে।[২]

[২] Essay in Honour Of Sushovan sarkar, People Publication House, new delhi,1976.

‘পরিচয়’ দলের সদস্যরা ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে বিশ্ব রাজনৈতিক আন্দোলনের মাত্রা দিতে তৎপরতা চালিয়েছিল। যেমন ফ্যাসিবাদী সোভয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারনে স্ট্যালিনের ভূমিকা, বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দা, ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী ভাবনার মধ্যে সাযুজ্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। সরকার নিজের শিক্ষকতা পেশার প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠাবান এবং কর্মের প্রতি অনুগত ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন দিল্লি থেকে ডেকে পাঠানোর পর সুশোভন সরকার High British official -এ সাক্ষাৎ করেনএবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের তৎপরতা ইতিহাসে সংযুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহন করেন।তিনি সাম্যবাদী যুক্তিযুক্ততার বাইরে গিয়ে ব্রিটিশ যুদ্ধ মনোভাবকে সমর্থন করেছিলেন। তবে এসবের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে কখনই ইঙ্গপ্রেমী বলা চলেনা, তথাকথিত ব্রিটিশ রাজের শিখরাবস্থাতেই তিনি সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনায় মুখর ছিলেন। যে সাম্রাজ্যবাদে ইউরোপের ইতিহাসবিদরা ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লবের মধ্যে উদারবাদী সম্ভাবনা দেখতে পান, যার থেকে যুক্তিবাদের যুগের সূত্রপাত ঘটেছিল, তাকে অর্থহীন করে তুলেছিল ১৯৩০ -র দশকে ফ্যাসিবাদের যুগ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকলে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে তীব্র হয়ে উঠতে থাকা বিশ্ব সংহতি ও বিশ্বচেতনার প্রতি তার সহমর্মিতা ছিল।

সুশোভন সরকারের একজন আদর্শ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামাজিক ভাবনার মধ্যেও একই আদর্শের ছাপ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি 1920 –র দশক থেকে শুরু করে 1930 –র দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত বিশ্বভারতীর নিত্য নৈমিত্তিক সাংগঠনিক কাজে সাহায্য করতেন। এই মহান কবি ও চিন্তাবিদ বুঝেছিলেন যে আঠারো ও উনিশ শতকে ইউরোপে যত

ইতিবাচক গুনাবলীর জন্ম হয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদ এই সবগুলিকেই বিনাশ ঘটিয়েছে। সুশোভন সরকার এই মতাদর্শকে সমর্থন করেছিলেন। অধ্যাপক সুশোভন সরকার মূলত ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক ধারনার আদর্শে আদর্শায়িত হয়েছিলেন এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকে তিনি সামাজিক সংস্কৃতির বিকল্প রূপে দেখেছেন।[৩]

ইউরোপীয় ইতিহাসে বিভিন্ন প্রান্ত যেমন- রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আলোচনা বিশেষত রাজনৈতিক দিকের ওপর অধ্যাপনা তাঁকে তার জীবদ্দশাতে কীংবদন্তীতে পরিনত করে তুলেছিল। রাজনৈতিক বিষয়ে বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি ম্যাকেনজি, মেইটল্যান্ড, প্রমুখ বিশ্লেষনী ব্যাক্তিত্ব, যাঁরা নিবিড় প্রন্থপাঠের ব্যাখ্যার কাজকে দক্ষতার সঙ্গে করে এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে তিনি পাঠকবর্গকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি দুষ্প্রাপ্য এবং জটিল রেফারেন্স উল্লেখ করে নিজেকে উন্নত করার মনোভাব দেখাননি বা তিনি তা পছন্দ করতেন না। যদিও তিনি তাঁর নিজের পড়াশোনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতেন।১৯৫০ - র দশকে প্রথমবার প্রকাশিত হয় "Past and Present" পত্রিকা, যেটি ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত "A Journal of Scientific History" শিরোনাম ব্যবহার করত।[2] এটিকে তিনি যারা নতুন মার্কসবাদী সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসে আগ্রহী ছিলেন তাদের দৃষ্টিগোচরে নিয়ে এসেছিলেন।

[৩] Essay in Honour Of Sushovan sarkar, People Publication House, new delhi,1976.

ব্রিটিশ মার্কসবাদী ঐতিহাসিকগন যেমন Khristofer Hill, E.P. Thompson. John Morris প্রমুখের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছিল "Past and Present" পত্রিকাটি। এই পত্রিকার সাংগঠনিক উদ্যোক্তাগন আলিগড় থেকে প্রফেসর ধুর্জটি প্রসাদ মুখার্জী ও সুশোভন সরকারকে আমন্ত্রন করেন। উভয়ের লেখা প্রকাশনার তরফ থেকে গ্রহন করা হয়। পরবর্তী সময়ে সরকার এই পত্রিকার সাংগঠনিক কাজে নিযুক্ত হন।

অধ্যাপক সুশোভন সরকারের শিক্ষাদান পন্থা ছিল অসাধারন। শ্রেনীকক্ষে তিনি সব ছাত্র ছাত্রীকে শেখাতেন কিভাবে গুরুভার বই গুলিকে আয়ত্তে আনতে হয়। ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি H.A.L Fisher- এর "History of Modern Europe", G.P Gutch এর "History and Historian in the Nineteenth Century" এবং ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষনের জন্য তিনি আধুনিক ইউরোপের ওপর রিভিংটন সিরিজের বইগুলি, ফরাসী বিপ্লবের শ্রেনীশক্তি এবং শ্রেনীসংগ্রামের ওপর মাথিয়ের লেখা, ফিশারের "বোনাপার্টিসম", গ্রীকদের ওপর জর্জ টমসনের বই ও থুকিডিডিসের রচনা উল্লেখ করতেন।

অধ্যাপক বরুন দে এ প্রসঙ্গে তাঁর কিছু ব্যাক্তিগত স্মৃতি উল্লেখ করেছেন। তিনি সুশোভন সরকারের শ্রেনীকক্ষে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। সুশোভন সরকার প্রথম বর্ষে তাদের ব্রিটিশ ইতিহাস পড়াতেন।সেই সুবাদে তিনি অধ্যাপক সরকারের শিক্ষকতার কৌশল, তাঁর বাচনভঙ্গিতে যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, তেমনই বিষয়গুলি ম্যাজিকের মতো আত্মস্থ করেছিলেন। তৃতীয় বর্ষে অধ্যাপক সরকার তাঁদের মধ্যযুগ সম্বন্ধে পড়াতেন। সেখানে দেখা

যায় অধ্যাপক সরকারের গঠন পদ্ধতির মাধ্যমে মধ্যযুগীয় ইতিহাস ও সমাজ ভাবনা দুটি ক্ষেত্রেই নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। প্রফেসর সরকার প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস বিশেষত "Violet crowned Athens" এর ইতিহাস এতটাই গভীর ভাবে পড়াতেন যে বাস্তবে তা সত্যি বলে মনে হত। তার প্রত্যেকটি বক্তব্য এবং বক্তব্যের সঙ্গে সঠিক বাচনভঙ্গিমা শিক্ষার্থীদের জ্ঞানকে পুষ্ট করেছিল।

১৯৩৫ –এ সুশোভন সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি প্রকরন গ্রন্থ রচনা করেন, যা "An Introductory Analysis of Dialectical Materialism" নামে প্রকাশিত হয়। এখানে মার্কস ও এঙ্গেলস্ এর আদর্শকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যায়িত করা হয়। প্রফেসর সরকার নিজেই বলেছিলেন যে এটি তাঁর নিজের রচনা নয়, এটি Sidney Hock এবং অন্যান্যদের রচনার ওপর গৌন রচনা, কিন্তু এটি ছিল প্রথম রচনা যেটি ঔপনিবেশিক প্রান্তিকতার সীমাবদ্ধতার মধ্যে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্লেষন করা হয়েছিল এবং মার্কসবাদকে তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ওপর যুক্তিপূর্ন দার্শনিক মতবাদরূপে বিশ্লেষিত হয়েছিল।

১৯৩৮ _এ মিউনিখে সুশোভন সরকার সাম্যবাদের ওপর যুক্তিপূর্ন মন্তব্য করেন। তিনি একই সঙ্গে কয়েকজন মেধাবী ছাত্র নিখিল চক্রবর্তী, অশোক মিত্র এবং পরে প্রতাপ সেন প্রমুখের সঙ্গে এ বিষয়ে আলচনা চালাতে থাকেন। 1938 –এ অধ্যাপক সরকার পুনরায় Calcutta Review –এ "Towards New World War" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা

করেন। পরে ১৯৩৩-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা প্রকাশনী থেকে "মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ" বইটি প্রকাশ করেন। E.H.Carr এর "International Relation Between the Wars" পড়ার আগেই R.P.Dutt এর "World Politics" বইটি পড়ার পর উক্ত গ্রন্থটি প্রকাশ করার অনুপ্রেরনা পেয়েছিলেন। গ্রন্থটি ব্যাতিক্রমি ভাবেই অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন এবং এখানে স্বচ্ছভাবে রাজনৈতিক বিষয়ে বিবরন দেওয়া হয়। বাংলা মাধ্যমে লেখা এই বইটি প্রকাশনার পর সুশোভন সরকার তাঁর ছাত্র ছাত্রীদের পরবর্তী দুই দশকে বিংশ শতকের ইউরোপীয় ইতিহাস বুঝতে সাহায্য করেছিলেন।

তিনি একটি নমুনার বর্গ (প্যারাডাইম) হিসাবে ইউরোপকে বেছে নিয়েছিলেন এবং কিছুটা অনুৎসাহিত ভাবেই ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপনা তাঁদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন যাদের কে তিনি প্রাচ্যবাদীদের ন্যায় প্রাচীনবাদী, না হয় মহাফেজখানা বিশেষজ্ঞ বলে মনে করতেন। উল্লেখ্য যে মহান পন্ডিত এবং প্রাচীন ভারতীয় কালানুক্রমের বিবরনীকার হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, যিনি ধ্রুপদী মানের "Political History of Ancient India" গ্রন্থের লেখক এবং কলকাতায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের কারমাইকেল অধ্যাপক ছিলেন, তার প্রতি তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।১৯৫০–এর দশকে অধ্যাপক সরকারের সমালোচকগন তাঁর অ্যাংলো- স্যাক্সন মনোভাবের জন্য প্রায়শই ওনার ব্রাম্ভ সমাজের আধুনিকতাপন্থী পরিবেশ এবং মূল্যবোধের দিকে নির্দেশ করেছেন।

সুশোভন সরকার ঘটনাবলী বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে প্রধান ঘটনার মধ্যে ক্ষমতার সরণের মুখ্যপ্রবাহগুলোর ওপর জোর দিয়েছেন। ঠিক যেভাবে আক্টন এবং পোলার্ড তাঁদের একই রকম উদারবাদী গ্রন্থগুলিতে দেখাতে চেয়েছেন।পশ্চিমী সভ্যতার বিশিষ্ট দিকগুলিকে তুলে ধরে সেগুলোর অন্তর্নিহিত কার্যকারণের ধাঁচগুলোকে তিনি বিশ্লেষন করতেন। যেমন ইউরোপীয় মধ্যযুগ, ইতালীয় রেনেসাঁস, সতেরো থেকে উনিশ শতকে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের ক্রমবিকাশ এবং ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে বুর্জোয়া বিপ্লব, শ্রমিক শ্রেনীর রাজনীতি এবং ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লব ইত্যাদি। এইসব প্রগতিশীল প্রবনতার মধ্যে তিনি মানবসমাজের বিরাট অংশের মানুষের দুর্দশা, দারিদ্র, বিচ্ছিন্নতা, উন্নয়নের পথে বাধার দিকটিকেও তুলে ধরেছেন। ঘটনার কার্যকারনের দ্বান্দ্বিকতার মূল্যায়ন করা,কোনো এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে তুল্যমুল্য বিচার করা ও বোঝা যায়, সে জন্য তিনি গনতন্ত্রের দিকে যে ইতিবাচক ঐতিহাসিক সরণ ঘটেছে, এবং তার যে নেতিবাচক পরিনতি ঘটেছে, তার থেকে শিক্ষাগ্রহনের ওপর প্রধানত জোর দিয়েছেন। তাঁর পড়ানোর মধ্যে কোনও ধরনের বুর্জোয়া- উদারপন্থী গোঁড়ামি ছিলনা।

শ্রেনীকক্ষের লেকচারে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের বক্তব্য বিশেষ করে ‘ইউরোপ আবিস্কার’ হয়তো আংশিকভাবে কার্ল মার্কসের নিজের ইউরোপকেন্দ্রিকতাকে অনুসরন করে গড়ে উঠেছিল। পুঁজিবাদের ইতিবাচক রুপান্তরের শক্তির যে প্রভাব পৃথিবীর ইতিহাসের ওপর পড়েছিল,তাতে মার্কস বিশ্বাস করতেন। ভারতে মার্কসীয় ইতিহাস চর্চা ও অধ্যাপনা এবং এদেশের ইতিহাসের ওপর ইউরোপকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পশ্চিমীয়ানার প্রভাব থাকলেও দেখা যায়, পশ্চিমী ইউরোপীয় চরিত্র সমূহ এবং জাতীয় বিকাশের প্রশস্তি রচনা যা দেখা

যায় সুশোভন সরকারের সমসাময়িক যেমন স্যার যদুনাথ সরকার, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার,এমন কি জাকারিয়ার দেওয়া তুলনা এবং ধ্যান ধারনার মধ্যে।

ইউরোপীয় ইতিহাসের সময়ের ছন্দ থেকে সরে এসে উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসে যখন মনে হয়েছিল যে মোড় ঘোরবার মুহুর্ত এসেছে, তখন সুশোভন সরকার কলম তুলেছিলেন। বাংলার রেনেসাঁস এবং অন্যান্য একই ধরনের বিষয়ের ওপর সাম্প্রতিক সংকলনগুলো এবং তাঁর লেখা অনেক প্রবন্ধের সংশোধিত সংস্করনে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তবে এসব নিয়ে লেখার অনেক আগেই ১৯৩০ –এর দশকের গোড়াতেই আঠারো শতকের বানিজ্যের ইতিহাস – ভারতের উত্তরপূর্ব এবং দক্ষিন পূর্বের প্রতিবেশী দেশগুলো নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রহ কী ছিল তা নিয়ে তিনি কাজ করেন। 'বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস'- অর্থাৎ আঠারো শতকে বাংলার কৃষিব্যবস্থা ও বানিজ্য –এর স্রষ্টা যিনি সবেমাত্র মহাফেজখানায় কাজ করতে শুরু করেছিলেন, সেই সময়ের মধ্যেই সুশোভন সরকার " Bengal Past and Present", "Journal of Burma Oriental Research Society", "Procidings of the Indian Historical Records Commission", এবং ১৯৩৯ সালেই "Procidings of the Indian History Congress" -এর মতো জার্নালে তিব্বত, ভুটান, ব্রম্ভদেশ এবং শ্যামদেশের সঙ্গে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বানিজ্যিক সর্ম্পকের রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে পাঁচটি নিখুঁতভাবে গবেষনা করা এবং প্রাঞ্জলভাবে লেখা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। যা পশ্চিমী ইতিহাসবিদ দের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

শিক্ষকতায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিঃ

শ্রেনীকক্ষে সুশোভন সরকারের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অচঞ্চল এবং স্বচ্ছ, কিন্তু তিনি নিখুঁতভাবে অন্যান্য দৃষ্টিকোনকেও তুলে ধরতেন। অধ্যাপক বরুন দে তাঁর ব্যাক্তিগত স্মৃতি থেকে উল্লেখ করেছেন যে প্রফেসর সরকার তাঁদের চতুর্থ বর্ষের অনার্স ক্লাসে দ্বাদশ চার্লসের ব্যার্থতার কারন লিখতে দিয়েছিলেন, সেটির উত্তর লেখার পর লেখাটির মার্জিনে তিনি তিক্ষ্নভাবে মন্তব্য করেন যে "আমি একজন প্রতিক্রিয়াশীলের মতো ভাবছি, কিন্তু যুক্তি পরম্পরার ধারাবাহিকতা বজায় থাকার কথা উল্লেখ করে আমাকে ৬০ শতাংশ নম্বর দেন"। সুশোভন সরকারকে গোঁড়ামিবিশিষ্ট মানুষ বলা যায়না। ১৯৫০ -এর দশকে তিনি স্তালিনকে একনিষ্টভাবে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু শ্রেনীকক্ষে পার্টিমনস্ক হওয়া তাঁর নিয়মের মধ্যে কোনভাবেই পড়তনা। তাঁর পরিশীলিত যুক্তির আকর্ষনেই ছাত্ররা মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেত, কোনও গোঁড়ামিযুক্ত ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ, বা পাঠ্যসূচির একচেটিয়া দখলদারি, বা পাঠ্যবইয়ের নিয়ন্ত্রনের দ্বারা নয়।

ব্যাক্তি হিসাবে সুশোভন সরকার কেমন ছিলেন বলতে গিয়ে অধ্যাপক বরুন দে তাঁর ব্যাক্তিগত স্মৃতি উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক সরকার একবার তাঁকে ব্যাক্তিগত সুরে বলেছিলেন যে, তাঁর কর্মজীবনের প্রথম দিকেই তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে একজন ভালো ইতিহাসবিদ হতে গেলে কাউকে হয় ভালো শিক্ষক, অথবা ভালো গবেষক হতে হয়। দুটো পূর্ণসময়ের পেশায় একই সঙ্গে কেউ ভালো হতে পারেন না। সুশোভন সরকার প্রথম পথটি বেছে

নিয়েছিলেন, কারন কমবয়সিদের কাছে সেটাই সব থেকে সেরা বলে বিবেচিত হয়। কিন্ত তাঁর গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলো ১৯৩০ থেকে ১৯৬০ –এর দশকের মধ্যেই লেখা।

১৯৩০ এর দশকের শেষ দিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সুশোভন সরকারের দুটি বই প্রকাশ করেছিল- একটি বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের ওপর,যেটি লেখা হয়েছিল যুদ্ধোত্তর আমলে মার্কসকেন্দ্রিক চর্চার অনেক আগে । অপরটি ছিল বাংলায় লেখা " মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ"। এই বইটি ব্যাতিক্রমী ভাবেই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবং এখানে স্বচ্ছভাবে রাজনৈতিক বিবরণী ছিল। বাংলাদেশে তাঁর অনুগামীরা সম্প্রতি এর পুনর্মুদ্রন করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি কমিউনিষ্ট দৃষ্টিকোন থেকে বাংলায় প্রচার পত্র লিখতেন। এ সবই তিনি করতেন ছদ্মনামে,কারন তিনি সরকারি শিক্ষাবিভাগের কর্মী ছিলেন। "ইতিহাসের ধারা" বইটি সেই সময়ে বিদ্যমান মার্কসবাদী ব্যাখ্যার প্রাঞ্জল আখ্যান, যা ১৯৪০ এর দশক এবং ১৯৫০ এর দশকের প্রথমদিকে কমবয়সি বাঙালি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খুবই প্রভাব ফেলেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত সময়ে প্রফেসর সরকারের সাম্যবাদী তৎপরতা তীব্রতর হয়েছিল। এই সময় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভিন্ন দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একই সঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতাজী সুভাসচন্দ্রের নেতৃত্বে সামরিক বিপ্লববাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে। যা বাংলা, পাঞ্জাব, এবং মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুতে শক্তিশালী হয়েছিল। জাপানের সঙ্গে ব্রিটেনের বৈরিতা থাকায় জহরলাল নেহেরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখরা সাম্যবাদের বিরোধিতা

করে কোনো বিপ্লব অক্ষশক্তির বিরূদ্ধে গড়ে তুলতে ভীত ছিল। তাঁরা যুদ্ধ শেষে নিজেদের দাবী দাওয়া পেশ করতে চেয়েছিল। উক্ত নেতৃবর্গ সবচেয়ে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল যখন জাপান দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সাম্যবাদী কার্যকলাপের ঘৃন্যতম রূপ প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যদিকে মুশলিম লীগ জীন্নার নেতৃত্বে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

অবস্থা এই সময় আরও জটিল হয়ে উঠতে থাকে, শুধুমাত্র ভারতে নয়, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিন পূর্ব এশিয়াতেও অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে ওঠে। দুটি শক্তিশালী শক্তিজোট বিশ্বের দুটি বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে থাকে। এই দুই শক্তিজোটের প্রধান শক্তি অর্থাৎ আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়া নিজেদের পারস্পরিক বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে সমগ্র বিশ্বকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছিল। এই জটিল পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল একটি মধ্যস্থতাকারী শক্তির।

ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় এখানকার কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো একটি নিরাপত্তা খুঁজতে চেয়েছিল। ১৯৪১ এ যখন নাৎসি বাহিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর আক্রমন করেছিল তখন ফ্যাসিবাদী ভাবধারা বিশ্বমাত্রা পাওয়ার সুযোগ উপস্থিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই Communist Party of India – এর উত্থানের পটভূমি তৈরি হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুশোভন সরকার এশিয়ার সার্বিক পরিস্থিতি অনুধাবন করেছিলেন বিশেষত জাপান যখন চীন আক্রমন করে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক মাও-শে-তুং যখন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে তখন ‘পরিচয়’ পত্রিকার সদস্যগন জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চীনা

জনগনের লড়াইকে সমর্থন করে। এই প্রেক্ষাপটে সুশোভন সরকার ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে "জাপানী শাসনের আসল রূপ" শিরোনামটি প্রকাশ করেন 'বিজন রায়' ছদ্মনামে।

'জাপানী শাসনের আসল রূপ' রচনাটি ছিল বার্মা বিজয়ের পর 'বৃহত্তর এশিয়া যৌথ সমৃদ্ধি ক্ষেত্র' সম্প্রসারিত করার জন্য জাপানী যুদ্ধপ্রচেষ্টার প্রতি উগ্র জাতি বিদ্বেষী সমর্থন ঠেকাতে ১৯৪২ সালে বাঙালীদের প্রতি আহ্বান।

১৯৪২ সালে জাতীয় স্তরে সমস্ত প্রধান নেতৃবর্গের গ্রেফতারের মাধ্যমে আগস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। প্রধান নেতাদের গ্রেফতারের পর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল একটি কেন্দ্রিয় শক্তির, কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ এই সময় এগিয়ে আসে। বাংলায় মেদিনীপুর জেলায় দুটি স্থান যেমন তমলুক ও কোঁটাই অঞ্চলে যেখানে গান্ধিজির আদর্শ পরিচালিত হত, সেখানে দেখা যায় একটি নৌকায় আগুন লাগানোর মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলন এবং সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছিল। ব্রিটিশ সরকার জোরপূর্বক কৃষকদের কৃষির বানিজ্যিকরনে বাধ্য করার ফলে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪৩ সালে দূর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। এই সময় সুশোভন সরকার বিভিন্ন জনসংঘ গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র সাধারন মানুষের সাহাযার্থে এগিয়ে আসেন। তিনি কোঁটাই অঞ্চলে বন্যায় আক্রান্ত ও দুর্ভিক্ষ কবলিত ব্যাক্তিদের ত্রান ও প্রাথমিক শুশ্রুষায় এগিয়ে আসেন। র‍্যান্ডন স্ট্রিটের কিছু রেড এড হসপিটাল আপৎকালীন চিকৎসার জন্য প্রস্তুত করা হয়। People's Relief Committee দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষদের সাহাযার্থে সরাসরি এগিয়ে আসে। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন কমিউনিস্ট নেতা যেমন পাঁচুগোপাল ভাদুড়ি, প্রফেসর সরকারের ছোটবেলার বন্ধু

নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ। এই সংস্থার পাশাপাশি ‘মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’-র নেত্রীবর্গ যেমন কমলা মুখার্জী প্রমুখ আর্থিক সাহায্যদানে এগিয়ে আসেন। খাদ্য এবং অন্যান্য পন্য সরবরাহে এগিয়ে আসে ‘Indian People Theatre Association’ । অভিনয়ের মাধ্যমে বাংলার জনজাতিকে একত্রিত করে লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে টিকিট বিক্রয়ের দ্বারা পীড়িত মানুষদের সাহাযার্থে এহিয়ে আসে।

১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে প্রফেসর সরকার তাঁর সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেন। বিদায় সম্মিলনীতে তাঁর ছাত্রদের চোখের জল তাদের প্রিয় শিক্ষককে ভাবান্বিত করেছিল। তাঁর শেষ বক্তৃতায় তিনি তাঁর জীবনের বিশেষ কিছু মুহুর্ত এবং শিক্ষকতার প্রতি তার মনোভাব ব্যাক্ত করেছিলেন। সুশোভন সরকার দেখিয়েছেন যে ইতিহাস হল জ্ঞানের সজীব শাখা, মৃত প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য নয়। প্রফেসর সরকার এই মতের প্রবক্তাদের ধারনা পালটে দিতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে ইতিহাস শুধুমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে অতীত সাল তারিখের দ্বন্দ্বের সমাধান করেনা, অতীতের ঘটনার প্রেক্ষিতে বর্তমান সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা (১৯৫৬-১৯৬১)

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহনের পর প্রফেসর সরকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যা পুর্বে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ নামে পরিচিত ছিল সেখানে নিযুক্ত হন। তিনি সেখানকার প্রফেসর এবং নবনির্মিত ইতিহাস বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন।

ব্যাক্তিত্বে তাঁর ৫৬ বছর বয়সেও তিনি ছিলেন অফুরন্ত প্রানসম্পদের অধিকারী। প্রফেসর সরকার ইতিহাস বিভাগে যোগদান করার পর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগের সিলেবাস –এর খসড়া তৈরি কপ্রেন। ইউরোপীয় ইতিহাসের নতুন ধারা সংযোজিত হয়, সেই ধারা তাঁর কন্যা শিপ্রা সরকার খুব দক্ষতার সঙ্গে বজায় রেখেছিলেন। শিপ্রা সরকার সমসাময়িক সময়ে ইউরোপীয় ইতিহাসের একজন দক্ষ শিক্ষিকা ছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন প্রফেসর সরকার বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে একজন যুব শিক্ষক অমর্ত সেনকে পাশে পেয়েছিলেন, যিনি সেই সময় অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ছিলেন।

এই সময় বিনয় চৌধুরী, সব্যসাচী ভট্টাচার্য প্রমুখ সুশোভন সরকারের মতাদর্শকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁরা সেই মতাদর্শকে পাশে রেখে বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। সব্যসাচী ভট্টাচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করার পর সরাসরি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে নিযুক্ত হন। বিনয় চৌধুরী যিনি এই সময় ত্রিশ বছর বয়সী ছিলেন, তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন (১৯৬২) এবং "National Council on Case Studies of Peasant Uprising in 19th century Bengal" এর ওপর একটি বক্তৃতা দেন।

১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে সুশোভন সরকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেন। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর তৃতীয় রচনা "Rammohon Roy and Indian Empire" প্রকাশ করেন। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রফেসর সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টিচার্স অ্যাসোসিয়েসান জার্নাল'- এ আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবান বক্তব্য প্রকাশ করেন।

অবসর গ্রহনের পর Socio Economic Research Institute in Calcutta- র প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। প্রফেসর সরকার একই সঙ্গে Centre for Studies in Social Science Calcutta- র ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেছিলেন।

প্রিয় শিক্ষকঃ সুশোভন সরকার

- পি সি জোশি

পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে পি সি জোশী ছিলেন একজন অন্যতম ব্যাক্তিত্ব। তিনি ব্যাক্তিগতভাবে সুশোভন সরকারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এবং সরকার প্রসঙ্গে বেশ কিছু স্মৃতি উল্লেখ করেছেন। প্রথমেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বাইরে ঘনিষ্ট ব্যাক্তিদের কথা উল্লেখ করেছেন,যাঁর মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রফেসর সুশোভন সরকার। এছাড়াও বলরাজ সাহানী, সুমিত্রনন্দন পন্থ (হিন্দি কবি), বিষ্ণু দে (বাঙালী কবি), গোপাল হালদার(লেখক) প্রমুখ। এদের মধ্যে সকলেই বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন ও প্রত্যেকেই নিজের জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। কিন্তু সুশোভন সরকার ছিলেন একেবারে আলাদা ধরনের ব্যাক্তিত্ব, যার তুলনা ছিল অনন্য সাধারন।

পি সি জোশী প্রথম সুশোভন সরকারের কথা শুনেছিলেন যখন জোশী মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় হাইকোর্টে আবেদন করার পর(১৯৩০) সবেমাত্র ছাড়া পেয়েছিলেন। কমিউনিষ্ট

পার্টির সংবদ্ধকরনে বিভিন্ন নেতারা উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সজ্জদ জাহীর এরকমই একজন ব্যাক্তিত্ব যিনি খুব দক্ষতার সঙ্গে পার্টির হয়ে লেখালেখি করতেন এবং তাঁর যোগাযোগ পরিচয় গোষ্টির সঙ্গে হয়। সেখানে বিষ্ণু দে ও সুশোভন সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। জোশী বান্নের কাছ থেকে সরকারের আদর্শ ও নীতি সম্বন্ধে অনেক কিছুই শুনেছিলেন, পরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু তিনি যখন শুনলেন প্রফেসর সরকার একজন সরকারী কর্মচারী, যিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত তখন তিনি কিছুটা সংকোচ বোধ করেছিলেন। কিন্তু প্রায় সকল রাজনৈতিক আদর্শবাদী ব্যাক্তিত্ব যাঁরা সরকারী কর্মচারী ছিলেন না তারা সকলেই সরকারের সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন। তখন সংকোচ কিছুটা দূর হয়।

জোশীর বক্তব্য অনুযায়ী প্রফেসর সরকারের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁরা এলগিন রোডের একটি ফ্লাটে থাকতেন। সাক্ষাৎকারের দিন " তিনি আমার (জোশী) জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং আমার দিকে হাতটি বাড়িয়ে নিজের পরিচয় দেনঃ আমি সুশোভন"। তিনি স্বভাবে খুব শান্ত ছিলেন, কিন্তু জোশীর কাছে খুবই গম্ভীর লাগত। প্রথম সাক্ষাতে তিনি নিজে কিছু বলার থেকে শুনতেন বেশি। তাঁর স্ত্রী একজন দক্ষ গৃহিনীর মতোই ঘর চালনা করতেন। জোশী যখন শুনেছিলেন যে তিনি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বোন, তখন তাঁর সঙ্গে জোশীর যোগাযোগ সহজ বলে মনে হয়েছিল। সুশোভন সরকারের বেশিরভাগ ছাত্রই ছাত্র আন্দোলন বা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। অনেকে কর্মসূত্রে বিদেশে থাকলেও স্বদেশে ফিরে তারা পার্টিতে যোগ দেয়। ফলে পার্টির পরিসর আরও বিস্তৃত হয়।

জোশীর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি প্রফেসর সরকারের সঙ্গে গবেষনা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগীতা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, এইজন্য তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন। জোশী জানতেন যে প্রফেসর সরকার একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক, ইতিহাস বিষয়ে বিশেষত আধুনিক ইউরোপ সর্ম্পকে তাঁর জ্ঞান আরও বিস্তৃত। জোশী প্রফেসর সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন যে ইউরোপের পাশাপাশি আধুনিক ভারত সম্বন্ধে কিছু লিখতে, কিন্তু তিনি এড়িয়ে যেতেন। অনুরূপ ভাবে জোশী সরকারকে বংলার রেনেসাঁস সম্পর্কে লিখতে বলেছিলেন, তখনও তিনি এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যখন পলিটব্যুরো থেকে জোরপূর্বক বলা হয় তখন তিনি আর না করেননি। যার ফলস্বরূপ প্রকাশিত হয় "Notes on Bengal Renaissance". People Publication House, New Delhi থেকে এটি প্রকাশ পায়। বইটি আমাদের গর্ব এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেফারেন্স হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

পি সি জোশী তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সুশোভন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ককে ব্যাক্ত করেছেন। রাজনৈতিক মতানৈক্যের জেরে জোশী যখন পার্টি থেকে সরে একজন সাধারন বামপন্থী কর্মী হিসাবে স্ত্রী কল্পনা দত্ত কে নিয়ে তাঁর পরিবারে থাকতেন, পুলিশি নজরদারী বাড়ায় সেখান থেকে সরে ফটোগ্রাফার সুনিল ঝা-র বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। কল্পনা এই সময় সুশোভন সরকারের বাড়িতে যান এবং "আমাকে" (জোশী) তাঁর গৃহে স্থান দেওয়ার জন্য বলেন। প্রফেসর সরকার বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে রাজী হয়র যান।

জোশীর বক্তব্য থেকে একথা বোঝা যায় যে, জখন জোশী পার্টি থেকে বহিস্কৃত হন তখন তাঁর সঙ্গে অন্যরা সম্পর্ক না রাখলেও সুশোভন সরকার তা বজায় রেখেছিলেন। ফলে তাঁর প্রতি জোশীর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

সুশোভন সরকারের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির যোগাযোগ ছিল। তিনি সবকিছু শুনতেন কিন্তু বলতেন কম। সঠিক সময়ে নিজের অবস্থান সূচিত করতেন। এই সমস্ত কাজকর্মের মধ্যেও তিনি নিজের শিক্ষকতা পেশার প্রতি অনেক বেশি আনুগত্য দেখাতেন। জোশী বলেছেন, যখন সুশোভন সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন বিভাগীয় প্রধান হিসাবে, তখন তিনি তার ছাত্রদের গবেষনার প্রতি উৎসাহিত করতেন এবং গাইডেন্স দিতেন এবং নতুন নতুন গবেষণাপত্র রচনাতে সাহায্য করতেন।

জোশীর ভাষায় প্রফেসর সরকার শুধুমাত্র একজন ভাল শিক্ষক ছিলেন না,একইসঙ্গে তিনি ছিলেন একজন ভাল মার্কসবাদী বিশ্লেষক। মার্কসবাদী ব্যাখ্যাকে তিনি খুব সহজবোধ্য ভাবে তাঁর ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতেন। তিনি তাঁর শিক্ষকতা পেশার প্রতি সৎ ও ভীষনভাবে দায়বদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত জীবন শিক্ষকতা পেশার প্রতি নিযুক্ত করেছিলেন।

পরবর্তীকালে তার ছাত্ররা অনেকেই তার আদর্শকে ভবিষ্যত কর্মে নিয়োজিত করেছিল। তাঁকে তাঁর ছাত্ররা একইসঙ্গে কমিউনিস্ট কর্মীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরন করত পরিবর্তিত সময়ের মধ্যেই। [3]

[3] Joshi.P.C- "A Dedicated Teacher-Some Memories", "Essay in Honour of Sushobhan Sarkar",People Publication House, New Delhi,1976.

তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাসে সুশোভন সরকারের অবদান

এই অধ্যায়ে মূলত আমরা ইতিহাসে সুশোভন সরকারের অবদান প্রসঙ্গে আলোচনা করব। সেক্ষেত্রে তাঁর লেখাপত্রগুলিকে পর্যালোচনা করব। এই লেখাগুলির মাধ্যমে তাঁর লিখনশৈলী স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করব। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি নিম্নরূপ—

১) বাংলার রেনেসাঁস।

২) ইতিহাসের ধারা।

৩) প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ।

৪) প্রসঙ্গ ইতিহাস।

৫) ইতিহাস চর্চা।

৬) মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ।

৭) Marxian Glimpse of History.

৮) Towards Marx.

গ্রন্থগুলিকে ক্রমান্বয়ে পর্যালোচনা করব--

বাংলার রেনেসাঁস

“বাংলার রেনেসাঁস”, কলকাতা, ১৩৯৭

সুশোভন সরকারের লেখালেখির পরিমান বিপুল নয়, যা লিখেছেন তার একটা বড়ো অংশ গ্রন্থবদ্ধ হয়নি, প্রবন্ধ সংকলন হিসাবে যে বইগুলি প্রকাশিত হয়, সেগুলি আজও দুষ্প্রাপ্য। ফলে তার রচনার সঙ্গে একালের পাঠকের তেমন পরিচয় নাও থাকতে পারে, কিন্তু একজন মহান ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর লেখাগুলি ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যা সকলের দৃষ্টিগোচরে আনা প্রয়োজন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Notes on the Bengal Renaissance" (১৯৪৬) ঠিক গবেষনা গ্রন্থ নয়, তবে তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপনায় এর মধ্যে যে নিষ্ঠা ও নৈপুন্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা সহজপ্রাপ্য নয়। বিংশ শতকের চারের দশকে শুধু নয়, আজকের দিনেও উনিশ শতকের বাংলাকে জানার জন্য গ্রন্থটি অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়।

'নোটস্' কিভাবে লেখা হয়েছিল সে বিষয়ে পি সি জোশী (সিপিআই- এর তদানীন্তন সম্পাদক)"এসেজ ইন অনার অফ প্রফেসর এস সি সরকার" গ্রন্থে ব্যাক্ত করেছেন। জোশী অনেকদিন ধরেই তাঁর সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক করেছেন যে তিনি যেহেতু আধুনিক ইউরোপকে এত ভালো করে জানেন,ওনার উচিত হবে বাংলার রেনেসাঁসের উদ্ভব নিয়ে একটা বই বা পুস্তিকা লেখা। জোশী জানতেন যে প্রফেসর সরাকার একজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ এবং তার বিশেষ দখল আধুনিক যুগের ওপর, তাই তিনি তাঁকে জোর করতে থাকেন। জোশী শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি পলিটব্যুরোর দাবী হিসাবে পেশ করে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে এবং এক্ষেত্রে

তাঁর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা যারা পার্টি কেন্দ্রে এবং বাইরে কাজ করছিলেন তাঁদেরকে কাজে লাগিয়েছিলেন। যার ফল ছিল এই গ্রন্থটি ।গ্রন্থটি বেশ কিছু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠ্য বই বা রেফারেন্স হিসাবে কাজ করে।

তবে উনিশ শতকের বাংলা নিয়ে লেখকের ভাবনাচিন্তা এখানেই থেমে থাকেনি – ইংরেজী ও বাংলায় তিনি একের পর এক অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন, যেগুলি ১৯৭০ সালে কলকাতা থেকে "On the Bengal Renaissance" নামে তাঁর আর একটি প্রবন্ধ স্নগকলন বার হয়, যেখানে আগের গ্রন্থটীর সাতটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

"Bengal Renaissance" বা "বাংলার রেনেসাসঁ" শব্দবন্ধটি এক হিসাবে তিনিই প্রথম ব্যাবহার করেন। অন্যরা বাংলায় রেনেসাসঁ বা বাঙালির রেনেসাসঁ বলে থাকেন। নবজাগরনের কালবিভাগ তিনিই প্রথম করেন। একজন বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী এবং সাধারন পাঠকের কাছে উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের প্রেক্ষাপট তিনি তুলে ধরেন। তাঁর কাছে রেনেসাসেঁর প্রধান ব্যাক্তিবর্গের অবদানগুলিকে তুলে ধরা ছিল অত্যন্ত জরুরী কাজ।

প্রথমেই তিনি বাংলার রানেসাসেঁর প্রকৃতি প্রসঙ্গে বলেন ব্রিটিশ শাসন, বুর্জোয়া অর্থনীতি এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব প্রথম অনুভূত হয় বাংলাতেই। এই প্রভাবের ফলে বাংলায় এক নবজাগরনের সূচনা হয়, যা বাংলার রেনেসাসঁ নামে পরিচিত। পরিবর্তনশীল আধুনিক বিশ্ব সম্বন্ধে সচেতনতার ব্যাপারে প্রায় একশো বছর ধরে ভারতের অন্যান্য

অংশের তুলনায় বাংলা অনেক এগিয়ে ছিল। তাই ভারতের নবজাগরনের ক্ষেত্রে বাংলার ভূমিকাকে তুলনা করা যায় ইউরোপীয় রেনেসাসেঁর ক্ষেত্রে ইটালির ভূমিকা প্রসঙ্গে।

আলোচনার সুবিধার্থে প্রফেসর সরকার পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করে নিয়েছেন

১) ১৮১৫-১৮৩৩--- রামমোহন রায়ের কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করা থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত।

২) ১৮৩৩-৫৭--- রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর থেকে ভারতীয় বিদ্রোহের সূচনা পর্যন্ত।

৩) ১৮৫৭-৮৫—ভারতীয় বিদ্রোহ থেকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত।

৪) ১৮৮৫-১৯০৫ —কংগ্রেসের সূচনা থেকে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত।

৫) ১৯০৫- ১৯—বঙ্গভঙ্গ থেকে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলন এবং নেতা হিসাবে গান্ধিজির অভ্যুদয় পর্যন্ত।

বাংলার রেনেসাসেঁর অগ্রপথিক রামমোহন রায়কে নিয়ে বিশ শতকের গোড়া থেকে এক ধরনের বিতর্ক গড়ে উঠেছে। তাঁকে একদিকে বলা হয়েছে ‘আধুনিক ভারতের জনক’, ‘ভারত পথিক’; অন্যদিকে সংকীর্ণতাবাদী, সংস্কার আন্দোলনে ব্যার্থ, এমনকি প্রতিক্রিয়াপন্থী

বলে অভিহিত করা হয়েছে। সুশোভন সরকার দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে নবজাগরনের আদি পুরুষ ছিলেন রামমোহন রায়। তিনি প্রথম থেকেই রামমোহনের ঐতিহাসিক গুরুত্বের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তিনি দেখিয়ছেন সাফল্যের পরিমান ও গুনের ক্ষেত্রে অথবা কাজকর্মের পরিধির মধ্যে তার সমকক্ষ কেউ ছিলনা। নতুন চিন্তাভাবনা যে এক জীবনদায়ী প্রেরণার ভূমিকা হতে পারে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা খুঁজে পাই তাঁর রচনাপত্রে। সুশোভন সরকার বলেছেন সাম্প্রতিককালে যারা তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করছে, তারা আসলে বাংলায় রেনেসাসেঁর তাৎপর্য উপলব্ধি করার ব্যাপারে নিজেদের অক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে।

আলোচ্য গ্রন্থে প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের সম্মিলনীপ্রয়াসীর ভূমিকায় রামমোহন রায় কে দেখানো হয়েছে। সেখানে প্রফেসর সরকার রামমোহন রায়ের হিন্দু একেশ্বরবাদের সমর্থন, খ্রিস্টান ধর্মের উদারনৈতিক পুনর্ব্যাখ্যা, ব্রাহ্ম আন্দোলনের ভিত্তিস্থাপন, ‘সতীদাহ প্রথা’র বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নতুন শিক্ষানীতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি, জাতীয় সচেতনতা এবং সংস্কারের জন্য সংগ্রাম, আন্তর্জাতিক সহানুভূতি ও যোগাযোগের বিবরণ সবিস্তারে উপস্থিত করেছেন। সুশোভন সরকার ইতিহাসের মধ্যে যে প্রগতির সন্ধান করেন, রামমোহনের চিন্তাভাবনায় সেই ধারনার প্রতিফলন দেখেছেন। তাঁর মনে হয়েছে রামমোহন মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নির্ভুল দিশাকে সামনে রেখে তাদের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য চিরন্তন কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন।

রামমোহন রায়কে নিয়ে চর্চার নিদর্শন মেলে আরও দুটি প্রবন্ধে-“ রামমোহন রায়ের ধর্মীয় চিন্তাধারা” ও “রামমোহন রায়ের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা”। প্রথম

প্রবন্ধটিতে আমরা দেখতে পাই রামমোহন রায়ের উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় গ্রন্থ "তুহ্ফাৎ-উল-মুয়াহদ্দিন" (১৮০৪)। রচনাটি ফারসী ভাষায় লেখা, ভূমিকাটি আরবি ভাষায়। এর ইংরেজী অনুবাদ হয় অনেক পরে, ১৮৮৪ সালে। এই গ্রন্থে সরকার রামমোহন রায়ের সমস্তরকম সংকীর্ণ বিশ্বাসমুক্ত ধর্মহীন ঈশ্বরবাদ, সেই সঙ্গে দেখা যায় মানুষের সহজাত গুন অর্থাৎ যুক্তির ওপর বারবার জোর দিয়েছেন তিনি। এই পুস্তিকায় রামমোহন রায় সমস্ত ধর্মীয় গোঁড়ামিকে সরাসরি আক্রমন করেছেন। বিভিন্ন ধর্মের গোঁড়ামিতে ভরা দাবিগুলিকে একে একে নস্যাৎ করেছেন। তিনি বলেছেন উপাসনার ব্যাপারে যতকিছু মূর্তি যত কিছু নাম পাওয়া যায় সবই কাল্পনিক। তিনি যে কোনো ধরনের মূর্তিপূজাকে সরাসরি আক্রমন করেছিলেন।

রামমোহন রায়ের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি চিরস্থায়ী ও রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন " উভয় বন্দোবস্তেই কৃষকদের অবস্থা শোচনীয়"। প্রথম বন্দোবস্তে তারা জমিদারদের অর্থলিপ্সা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বলি হয়, দ্বিতীয়টিতে জরিপকারী এবং রাজস্ববিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তাদের শোষন ও চক্রান্তের শিকার হয়। একইসঙ্গে বিভিন্ন জরুরী বিষয় নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন- মজুরীর স্বীকৃতি,জমিদার ও পুলিশের ঘনিষ্ট সহযোগিতা, রাজস্ব দিতে না পারা ইত্যাদি । সুশোভন সরকার রামমোহন রায়ের কৃষকদের প্রতি সুবিচার করার মনোভাব ব্যাক্ত করতে গিয়ে তাঁর একটি উক্তি তুলে ধরেছেন-" ভারতবর্ষের কৃষকদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য যাবতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি"। সরকার দেখিয়েছেন বিচারবিভাগের পরিচালন ব্যাবস্থা প্রসঙ্গে রামমোহন রায় বলেছিলেন " ন্যায় বিচারের পথে প্রধান অন্তরায় হল এই

যে পরিচালক বর্গ এবং তাঁদের দ্বারা পরিচালিত ব্যাক্তিদের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা"। সুশোভন সরকার এইভাবে একজন প্রতিভাবান পুরুষের বক্ত্যব্যগুলিকে তুলে ধরেছেন। রামমোহন রায়ের অর্থনীতিচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধে সংযোজনী টীকায় লেখক জানিয়েছেন " রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তাধারাকে তার সামগ্রিকতায় বিচার করা হয়নি প্রবন্ধটিতে, অনেক কিছুই বাদ রয়ে গেছে"।

বাংলার নবজাগরনে ডেভিড হেয়ারের প্রসঙ্গ সুশোভন সরকারের আলোচনায় একজন নিষ্ঠাবান, কর্ত্যপরায়ন,উদ্যমী মানুষ রূপে বর্ণিত হয়েছে। তিনি মনে করতেন শিক্ষাই পারে হিন্দুদের মুক্ত করতে এজন্য তিনি ১৮১৬ সালের ১৪ মে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ওই কলেজের প্রথম নিয়মবিধি রচনার কাজেও সাহায্য করেছিলেন তিনি। ১৮১৭ সালে হেয়ার স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় বই বাদে বিভিন্ন ভাষায় বিদ্যালয় পাঠ্য বই বিনামূল্যে প্রদান করা। সুশোভন সরাকারের কাছে ডেভিড হেয়ার ছিলেন একজন প্রবর্তক নতুন শিক্ষা ব্যাবস্থার ক্ষেত্রে।

সুশোভন সরকার তার প্রবন্ধে ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট যুক্তিভিত্তিক আদর্শবাদ, তাদের সাহস এবং ব্যাক্তিগত সততার কথা বলেছেন। ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল সম্বন্ধে সে সময় পর্যন্ত যা কিছু তথ্য পাওয়া গেছে, তা সংগ্রহ, বিন্যাস ও ব্যাখ্যায় নৈপুন্যের পরিচয় মেলে প্রবন্ধটিতে। ছাত্র ডিরোজিওর উপর গুরু ডেভিড ড্রামন্ডের প্রভাবের মধ্যে তিনি দেখেছেন সাহিত্য- দর্শন মগ্নতা,ফরাসী বিপ্লব ও ইংরেজ র‍্যাডিক্যাল

মতবাদে বিশ্বাস। ডিরোজিওর প্রভাবেই ছাত্রদের মধ্যে বেকন, লক, হিউম, স্মিথ, পেইন ও বেন্থামচর্চা ব্যাপক প্রসারলাভ করেছিল। ডিরোজিওকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার উদ্যোগে কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত অভিযোগ এনেছিলেন এবং ডিরোজিও প্রত্যুত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থনে উইলসনকে যে চিঠি লেখেন সেটিকে সরকার বাংলার রেনেসাসেঁর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দলিল বলে চিহ্নিত করেন। তিনি দেখিয়েছেন রক্ষনশীল দলের ভ্রষ্টাচার ও মিথ্যাচারের পরিবর্তে বিচারবোধ ও কিছু না মানার আস্ফালন সে সময়ে অস্বাভাবিক ছিলনা। ইংরেজিয়ানা সত্ত্বেও মাতৃভাষার প্রতি টান কম ছিলনা ডিরোজিওপন্থীদের।

একইসঙ্গে সরকার বাংলার নবজাগরনে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি দেখিয়েছেন উনিশ শতকের উত্তাল তরঙ্গের শীর্ষমনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁরই মধ্যে প্রেরণার সকল অঙ্গ শ্রেষ্ঠ প্রকাশ পেয়েছিল। সে যুগের সকল চিন্তা, পরস্পর বিরোধী ভাবধারা, সমস্ত ঘাত প্রতিঘাতে আলোড়ন এনেছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবজাগরন সম্বন্ধে সুশোভন সরকারের শেষ কথা, বাংলার নবজাগরনের ইতিহাসে পশ্চিমী দৃষ্টিকে তিনি প্রাচ্যাভিমানের উপর স্থান দিয়েছিলেন। এড় মূল কারন ছিল- এই জাগরনের মূল প্রেরণা আসে নূতনের আগমনে, প্রাচীন রক্ষন শিলতা ঠিক তার আদি উৎস ছিলনা, দ্বিতীয়ত- ভবিষ্যতের স্বপ্নে যে ভারতবর্ষ বিরাজ করছে, তার বাহ্যিক আকার যে রূপ নিক না কেন, অন্তর্বস্তুটুকুটে পশ্চিমী না বলে উপায় নেই। যে সমাজবাদ সকলের কাম্য

ন্যায্যত তার সঙ্গতি পাওয়া যায় প্রাচ্যাদর্শে ন্য, পশ্চিমী দৃষ্টিরই মধ্যে, যে পশ্চিমী সংস্কৃতি থেকে তার উদ্ভব ও পরিনতি।

ইতিহাসের ধারা

মনীষা, কলকাতা, ১৯৪৪।

বিংশ শতকের চারের দশকের মাঝামাঝি সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারন সম্পাদক পি সি জোশীর সঙ্গে সুশোভন সরকারের পরিচয় হয়। জোশীর অনুরোধেই সম্ভবত পার্টির কর্মীদের ইতিহাসের পাথগ্রহণের জন্য লিখতে হয় "ইতিহাসের ধারা"(১৯৪৪) ও **"Notes on the Bengal Renaissance"**(১৯৪৬) এগুলি গবেষণাগ্রন্থ না হলেও দীর্ঘদিনের পঠন-পাঠনের ফল।

"ইতিহাসের ধারা" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে, 'অমিত সেন' এই ছদ্মনামে। বইটি লেখা হয় সাধু ভাষায়, তখঙ্কার নেতাদের নির্দেশে। তাঁদের যুক্তি ছিল কলকাতার বাইরে এই ভাষাই নাকি সহজবোধ্য। গ্রন্থটি লেখা কমিউনিস্ট কর্মিদের জন্য,তাঁদের নানা বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা নিতে হয়; তখন গোটা ইতিহাসের একটা পটভূমিকা হাতের কাছে থাকলে অনেক সুবিধা হবে – এই কথা মাথায় রেখেই সুশোভন সরকার গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি মোট ১১ টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত-

- মার্কসবাদের নানাদিক।
- ইতিহাসের মূল প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট।
- বিভিন্ন ধরনের সমাজব্যবস্থা।
- আদিম শ্রেনীহীন সমাজ।

- প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যসমাজ।
- গ্রীস ও রোমের দাস প্রথা।
- ফিউডাল সামন্ততন্ত্র।
- মধ্যযুগের রূপান্তর।
- পূর্ণ ধনিকতন্ত্রের সমাজ।
- ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা।
- সমাজতন্ত্রের সূচনা।

১) মার্কসবাদের নানাদিক

সুশোভন সরকার বইটির প্রথম অধ্যায়ে মার্কসবাদকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন কার্ল মার্কস ও তাঁর চিরজীবনের বন্ধু ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস কমিউনিস্ট আন্দোলন আরম্ভ করেন। এর প্রভাব পৃথিবীর সর্বত্র এবং রাশিয়াতে এই সাম্যবাদের প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যায়। সাম্যবাদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি বলেন –"মানুষের সমাজে প্রগতির স্বাভাবিক ঝোঁক এখন শ্রেনীহীন সমাজ গঠনের দিকে। সজাগ হইয়া সেই ঝোঁকের সহায়তা করার নামই সাম্যবাদ"।

সাম্যবাদী চিন্তাধারা ও কার্যপ্রণালীর প্রথম পথ-প্রদর্শক হিসাবে মার্কস এর নাম অমর। সেইজন্য সাম্যবাদকে মার্কসবাদ বলা হয়। সুশোভন সরকার সাম্যবাদ ও তার বৈশিষ্ট্যকে কয়েকটি পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। যা কমিউনিস্ট মতাদর্শ বোধগম্যতায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। প্রথমত- ইতিহাসের ধারা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক,এর সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি মানব সমাজ যুগে যুগে কী রূপ গ্রহন করেছে, সমাজের পরিবর্তন কোন পথে চলেছে,সমাজের পুনর্গঠনে কোন চেষ্টা সার্থক আর কোন ছেষ্টা নিষ্ফল।

দ্বিতীয়ত- মানুষের জীবনযাত্রার সঠিক খবর রাখতে হলে অর্থনীতির বিষয়টি ভালো ভাবে বুঝতে হবে।

তৃতীয়ত- মার্কসবাদের আরেকটি দিক হল একটি দৃষ্টিভঙ্গী ,তার না ডায়ালেকটিক্যাল বস্তুবাদ। এর মূল কথা বাইরের জগৎ এবং মানব জগৎ একটি সাধারন নিয়ম মেনে চলে।

চতুর্থত- রাজনৈতিক কাজের ধরন যা রাষ্ট্রশক্তির প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করে।

পঞ্চমত- স্বদেশের অবস্থা ও স্থানীয় সমস্যার আলোচনা, প্রতি মুহূর্তে সাম্যবাদী দলকে চারিদেকের অবস্থা বুঝে কাজ করতে হয়। স্বাভাবিকভাবে মূলনীতি প্রয়োগের বিশেষ রূপ নির্ভর করে বিশেষ অবস্থার ওপর।

সাম্যবাদের ষষ্ট দিক হল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক অন্য দেশের অভিজ্ঞতার কথা,জগতের যে অংশটি আজ সামাজিক প্রগতিতে অন্য সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছে তার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ।

সুশোভন সরকার ভবিষ্যত সম্পর্কে বলেছেন যে, " সাম্যবাদী আন্দোলনে যুক্ত থাকিয়া প্রতিদিনের কাজের মধ্যেই মার্কসবাদ আয়ত্তে করিবার শ্রেষ্ট পথ আছে। তাহা হইলে শুধু পুঁথি পড়া মুখস্থ বিদ্যার বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু সেই প্রাত্যহিক কাজের সঙ্গে সঙ্গেই সাম্যবাদের ভিন্ন ভিন্ন দিক সম্বন্ধে শিক্ষা ও আলোচনা চলা উচিত"।

২) ইতিহাসের মূল প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

সুশোভন সরকার মার্কসীয় আঙ্গিকে ইতিহাসকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং মানুষের জীবনকে মার্কসবাদ অনুযায়ী কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে আলোচনা করেছেন। যেমন –ইতিহাসের প্রথম কথাই হল পরিবর্তন, কোনো প্রথাই তাই অনন্ত হতে পারেনা। মানুষের ইতিহাসে অনন্ত বা স্থীর বলে কিছু নেই। বৈজ্ঞানিক্রা এই ধারনাকে এভলিউশন বা ক্রমবিকাশ নাম দিয়েছেন। সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের স্রোত ধীরে ধীরে বয়ে চলে কিন্তু যুগান্তরের সময় হঠাৎ বিপুল বেগে পরিবর্তন এসে পড়ে- আর এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

সাম্যবাদের বিশ্বাস যে বিপ্লবকে বাদ দিয়ে অগ্রগতি চলিতে পারেনা, আবার সকল অবস্থাতেই যে বিপ্লব হতে পারে তাহাও নয়। ইতিহাসে যেখানেই শ্রেণীভেদ সেখানে কোনো না কোনভাবে শ্রেণী বিরোধের অস্তিত্ব থাকে। কমিউনিস্ট ইস্তাহারে মার্কস ও এঙ্গেলস

বলেছেন যে –"শ্রেনী-বিভক্ত সমাজের সমস্ত ইতিহাস আসলে শ্রেণী- সংগ্রামের কাহিনী"। ধারাবাহিক ইতিহাস যতদিন থেকে আরম্ভ হয়েছে, তখন থেকে শ্রেণীবিভাগ সকল সমাজেরই মূল অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে,শ্রেণী-বিরোধের অবসান হতে পারে না।

পরিবর্তনের অন্তহীন প্রবাহ,সেই ক্রমবিকাশের অসমান গতি, স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবেই মাঝে মাঝে বিপ্লবের আবির্ভাব, শ্রেণী বিভক্ত সমাজের অভ্যন্তরে বাইরের সকল বৈচিত্রের আড়ালে শ্রেনী-স্বার্থের প্রাধান্য এবং শ্রেনী সম্বন্ধ বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সমাজের উদয় হয়েছে- এটিকেই মার্কস ইতিহাসের প্রধান বিশেষত্ব বলে মনে করেন।

৩) বিভিন্ন ধরনের সমাজব্যাবস্থা

তৃতীয় অধ্যায়ে সুশোভন সরকার মানুষের আদিম সমাজ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সমাজব্যাবস্থার উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন মানব জাতির শৈশবকালের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়না, সেই সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য সেখানে কোনো শ্রেনী বিভাগ ছিলনা, মানুষ ছিল খাদ্য সংগ্রাহক, সম্পত্তি বা ব্যাক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ক্রমে মানুষ কৃষিকার্যের দিকে এগিয়ে যায়,সমাজও দ্রুত একধাপ এগিয়ে যায়। উৎপাদনের উন্নতির ফলে ধনসঞ্চয়ের সূত্রপাত হয়, এবং সভ্য সমাজের উৎপত্তি হয়।

তিনি উদাহরন প্রসঙ্গে ইজিপ্টের নীল নদ, ইরাক অঞ্চলে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস, চীনদেশে হোয়াংহো ও ইয়াং সিকিয়াং, ভারতে সিন্ধু ও গঙ্গা- এইসব নদীকেন্দ্রিক সভ্য সমাজের উল্লেখ করেন। তিনি দেখিয়েছেন আদিম প্রাক সভ্য সমাজের পর মানুষের সভ্যতার প্রথম স্তর হল এশিয়াটিক সমাজ এবং এই স্তরেই শ্রেণীভেদ আত্মপ্রকাশ করে। উৎপাদনের উপাদান যাদের হাতে ছিল তারাই সমাজের শাসকশ্রেনীতে পরিনত হয় এবং সাধারন মানুষকে সমাজের শাসনে বেঁধে রাখার জন্য পুরোহিতশ্রেনী ও সংগঠিত ধর্মের আরম্ভ। তিনি একইসঙ্গে দাস প্রথার উদ্ভবের কারন প্রসঙ্গে অর্থনীতিকে দায়ী করেছেন।তিনি দেখিয়েছেন ইউরোপের যে অঞ্চলে প্রথম সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল সেখানে এশিয়াটিক সমাজের জন্মভূমিগুলির মতো নদীবহুল উর্বর প্রদেশ ছিলনা। অল্প পরিশ্রমে প্রচুর ধন উৎপাদন সেখানে সম্ভব হয় নাই, অসংখ্য লোককে দাসের পর্যায়ে এনে না ফেললে সেখানে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ছিল না।

প্রফেসর সরকার দাস প্রথার বিস্তার প্রসঙ্গে বলেন রোম সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দাস প্রথা ইউরোপের অনেকাংশে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে সমাজেরও ভাঙন হয়েছিল। রোমান আমলের শেষের দিকে দাসত্ব প্রথা অচল হতে থাকে। তারপর আসে ফিউডাল বা সামন্ততন্ত্রের যুগ। কৃষির কাজ ফিউডাল সমাজের প্রধান উপজীবিকা হলেও সেযুগে নানা জিনিস কারিগরেরা প্রস্তুত করতে থাকে ক্রমে ব্যাবসা বানিজ্যের বিস্তার হতে থাকে। তারপর আঠারো উনিশ শতকে পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে ক্যাপিটালিস্ট ধনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এর প্রভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব ইউরোপের ফিউডাল সমাজ ও প্রাচ্যদেশের এশিয়াটিক সমাজ এর ফলে রূপান্তরিত হতে লাগল।

সুশোভন সরকার পরবর্তী পর্যায়ে সোশালিজম বা সমাজতন্ত্র ব্যাবস্থার কথা বলেন। তিনি এই সমাজব্যাবস্থাকে আলাদা বলেছেন কারন এই সমাজব্যাবস্থায় উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলিতে ব্যাক্তিগত অধিকার লোপ দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে জমি, খনিজ সম্পদ, কলকারখানা, যানবাহন, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সাধারনের সম্পত্তি বলে গন্য হয়। প্রফেসর সরকার আশা করেন যে ভবিষ্যতের শ্রেণীবর্জিত সমাজ গড়ে উঠলে সেখানে আর্থিক বিরোধের অবসান হবে, কিন্তু তা বলে মানুষের জীবনে পরিবর্তনের গতি বন্ধ হয়ে যাবে এ কথা ভাবা অন্যায়। সমাজের জীবনযাত্রায় অন্য প্রকারের ঘাত প্রতিঘাত থেমে থাকতে পারেনা তার মধ্য দিয়ে নতুন প্রগতির পথে মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়। যুগবিশেষে এক অঞ্চলে একাধিকের প্রাধান্য থাকে তার একটি হল যুগধর্ম এবং তা থেকেই সেই সমাজের নাম।

৪) আদিম শ্রেনীহীন সমাজ

চতুর্থ অধ্যায়ে সুশোভন সরকার ইতিহাসের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি সমাজের পরিবর্তনের মূলে অর্থনীতিকে দায়ী করেছেন তিনি দেখিয়েছেন যে খাওয়া- পরার সংস্থান ও প্রয়োজনীয় অন্য সকল জিনিস জোগাড় করার চেষ্টা নিয়ে মানুষের আর্থিক জীবন। আদিম যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই আর্থিক জীবনে বারবার পরিবর্তন এসেছে সমাজও পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে মানুষের জীবন ছিল পশুর জীবনযাত্রার মত, বরফের যুগে মানুষ কোথায় কিভাবে জীবন ধারন করত তা বলা কঠিন। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মাধ্যমে জানা গিয়েছে যে এই সময় মানুষ প্রথম হাতিয়ার তৈরী করতে শেখে। ধীরে ধীরে মানুষের যাযাবর জীবন থেকে সরে এসে স্থীরভাবে বসবাস করতে করতে শুরু করে,এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে চাষের ধারনা আসে। ক্রমে মানুষ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে শেখে। চাষ

বাসের সূত্রপাত হয়। কৃষিকার্যের পরিবর্তনের ফলে লোহার জিনিসপত্র তৈরির মানসিকতা চলে আসে। এই সময় থেকে ছেলেদের কর্তৃত্ব মেয়েদের ওপর প্রাধান্য পায়। ধীরে ধীরে মানুষ পশুপালনের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে মানুষের আদিকালের সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে পড়তে থাকে। তিনি বলেছেন প্রাচীন জগৎ কেমন ছিল তা এখনো অনিশ্চিত। নূতন নূতন আবিস্কারের ফলে পূর্বের মানচিত্রের বদল হয়। তিনি সকল বিজ্ঞানেও এই কথা পযোজ্য বলেছেন। তিনি এও বলেছেন যে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে মার্কসবাদের মূল কাঠামোর পরিবর্তন আসেনা, তার বাস্তব আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গীও থাকে অপরিবর্তীত।

৫) প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্য সমাজ

পঞ্চম অধ্যায়ে অধ্যাপক সরকার প্রাচ্য উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ইত্যাদি স্থানের অতীত কালের আদিম সাম্যতন্ত্রের অস্তিত্বের কথা তুলে ধরেছেন। তারপর সেখান থেকে সভ্য সভ্যতা, আর্থিক স্তরভেদ ইত্যাদির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। তারপর তিনি শ্রেণীবিভক্ত সভ্য রাষ্ট্রশাসিত সমাজের উদাহরন প্রসঙ্গে এশিয়াটিক সমাজের কথা তুলে ধরেন এবং প্রাচীনতম জনপদগুলি প্রথম গড়ে ওঠার স্থান হিসাবে ইরাক নদীর দুই ধারে, যার নাম ছিল সেনার –উল্লেখ করেন। জানতে পারি যে সুমের ও আক্কাদ জনপদ্গুলিকে প্রথম সভ্য শ্রেণী সমাজ বলে থাকি। এই দুটি স্থানে কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে ধনসঞ্চয় এবং তাকে কেন্দ্র করে ধনী-গরীব ভেদাভেদ ও শেষ পর্যন্ত ছোটো ছোটো খন্ড রাজ্যের উদ্ভব হয়।

তারপর আবার এক শতাব্দী পর স্বাধীন ব্যাবিলনিয়ার নূতন সাম্রাজ্য মাথা তোলে- ইতিহাসে তার নাম কালাডিয়া সাম্রাজ্য। কালাডিয়ার পর আসে পারস্য সাম্রাজ্য, যা খ্রীষ্টের জন্মের ৩৩০ বছর আগে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার দ্বারা পদানত হয়। এইভাবে পশ্চিম এশিয়ায় প্রাচীন যুগ শেষ হয়।এরপর তিনি মিশরীয় সভ্যতার কথা তুলে ধরেন যেখানে পুরানো এশিয়াটিক সমাজের অস্তিত্ব দেখা যায়। একইসঙ্গে তিনি চীন ও ভারতের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। দেখান যে চীনে কৃষি সমাজ গড়ে উঠেছিল হোয়াং হো নদের উর্বর অঞ্চলে পরে তা ইয়াং সিকিয়াং নদীর উপকূলে তার বিস্তৃতি হয়। সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে শ্রেনীভেদ এখানেও প্রবল হয়ে ওঠে। ভারতের প্রসঙ্গে তিনি একই কথা তুলে ধরেন এবং দেখান যে "ভারতীয় সংস্কৃতি ইতিহাসে গৌরবময়, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সমাজে শ্রেণীভেদ ও শোষনকে অস্বীকার করা পাগলের প্রলাপ। প্রাচীন হিন্দু ধর্মের একটি কীর্তি উল্লেখযোগ্য- কর্মফল এবং জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের প্রচলন শোষনের বন্দোবস্ত পাকা করিবার প্রবল উপায়"।

৬) গ্রীস ও রোমের দাস-প্রথা

ইউরোপে আদিম অসভ্য সমাজের রূপান্তর আরম্ভ হয় প্রথমে দক্ষিন অঞ্চলে, বিশেষত গ্রীস ও রোমে। পরিণত অবস্থায় তার আর্থিক গড়নের মূল রূপ ছিল- দাসদের পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করা। অধ্যাপক সরকার ষষ্ট অধ্যায়ে মূলত গ্রীস ও রোমের দাস ব্যাবস্থার গড়ে ওঠা ও তার বিস্তার নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রীস দেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে অন্য দেশের মতো দাস প্রথা আরম্ভ হয়। তবে দাসরা গ্রীক অভিজাতরা গৃহের

কাজেই নিযুক্ত করত। পরবর্তীকালে ব্যাবসা বানিজ্যের প্রসারের ফলে দাসরা কারিগরদের কাজ করতে থাকে। পরবর্তীকালে দাসদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকায় দাসরা বিদ্রোহ শুরু করে। সমাজব্যাবস্থায় অচলাবস্থার সৃষ্টির ফলে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়। পরবর্তীকালে আলেকজান্ডার গ্রীক রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা করে কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

রোমের ক্ষেত্রে দেখা যায় ইটালিতে আদিযুগে গ্রীক নগররাষ্ট্রের মতো খন্ড খন্ড রাজ্য চারিদিকে গড়ে ওঠে। রোমের ক্ষেত্রে তিনি দেখান যে সেখানকার অভিজাতশ্রেণী অর্থাৎ প্যাটরিসিয়ানরা অনেখখানি করে ভালো জমি দখল করে বসে। তারা তাদের সম্পত্তির বলে বেশ কিছু দাস সংগ্রহ করতে থাকে। তারা রাজতন্ত্রের সৃষ্টি করে কিছুদিন পরে রাজাকে তাড়িয়ে রোম রিপাবলিক হয়। অভিজাতরা তখন নিজেদের হাতে সমস্ত রাজ্যভার গ্রহন করে। সাধারন লোকেরা ক্রমে ক্রমে সম্পত্তিহীন হয়ে পড়ে। অভিজাত শ্রেনী ছাড়া অন্য সকল শ্রেণীর নাম হয় প্লেবিয়ান। খ্রীষ্টের জন্মের আগের পঞ্চম ও চতুর্থ শতকে, প্যাটরিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের শ্রেণীবিরোধ রোমের ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য।

প্রফেসর সরকার দেখিয়েছেন দাসবিদ্রোহ রোমান সাম্রাজ্যে বারবার ঘটেছে , তাতে দাসদের জয় হয়নি, কিন্তু সমাজ দুর্বল হয়ে পড়েছে। পরবর্তীকালে রোমে অভিজাতদের মধ্যে গৃহবিবাদ অবশেষে রিপাবলিকের পতন আনে। টুকরো টুকরো জমিতে ছোটো ছোটো চাষী বসিয়ে চাষের কাজ তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে উৎপন্ন দ্রব্যে

ভাগ বসাইবার রীতি এখন দেখা যায়। মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র তারই পূর্বাভাস। ইতিমধ্যে টিউটন আক্রমনে পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্যের অবসান হয়। ইউরোপের দাস সমাজের শেষ হয়।

৭) ফিউডাল সামন্ততন্ত্র

গ্রীস ও রোমের দাস ব্যাবস্থার প্রচলন ও তার শেষ আলোচনার পর তার রেশ টেনে পরবর্তী পর্যায়ে সমাজ জীবনে যে পুনর্গঠন হল-তার নাম ফিউডাল বা সামন্ততন্ত্র। সপ্তম অধ্যায়ে সুশোভন সরকার এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। সরকার ফিউডাল সমাজের উৎপত্তির দুইটি ধারা বিশ্লেষন করেছেন। একদিকে রোমান সাম্রাজ্যের দাসপ্রথা অচল হয়ে পড়া ও অন্যদিকে নূতন আর্থিক বন্দোবস্ত। খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে আস্তে থাকে, সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জার্মান জাতি রোম দখল করতে থাকে। জার্মানরা দাস প্রথায় বিশ্বাসী ছিলনা, তারা দাস না রেখে ছোটো ছোটো চাষীর পরিশ্রমে ভাগ বসানোই সুবিধা বলে মনে করত। সাধারন জার্মান যোদ্ধারা গ্রাম গড়লেও তা এসে পড়ে জমিদারদের হাতে। ফিউডাল ইউরোপের প্রধান দুই শ্রেণী- জমিদার সামন্তরা এবং সাধারন সার্ফ বা কৃষকগন। সার্ফদের নিজস্ব জমি থাকলেও সেই জমি ছেড়ে চলে যাওয়ার অধিকার তাদের থাকতনা ফলে তাদের ভূমিদাস বলা হত। তাদের অর্ধেক সময় প্রভূর জমিতে হাজির থেকে বেগার দিতে হত। প্রফেসর সরকার দেখিয়েছেন যে ফিউডাল যুগে পাদ্রিদের ও তাদের প্রতিষ্ঠান ক্যাথলিক চার্চের প্রতাপ প্রায় অসীম হয়ে ওঠে। চার্চের গঠনে সামন্ততন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সাধারন দিক থেকে প্রফেসর দেখিয়েছেন পুরোহিত ও সামন্তশ্রেণী –এই দুই শোষকের মধ্যে নিজেদের অধিকারের সীমা নির্ধারনকে কেন্দ্র করে প্রচন্ড

ঝগড়া চলে। চার্চ ও রাজশক্তির দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন ধরে চলে। ধীরে ধীরে কারিগর ও বনিক শ্রেণীর আগমন ও তাকে কেন্দ্র করে ম্যানরে সংবদ্ধ হওয়ার রীতি, কারিগরদের গিল্ড স্থাপন ইত্যাদির ফলে সামন্ততন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার পতন সূচিত হয়।

৮) মধ্যযুগের রূপান্তর

অষ্টম অধ্যায়ে সুশোভন সরকার ফিউডাল সমাজ থেকে ক্যাপিটালিস্ট ধনিকতন্ত্র গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কতগুলি দিকনির্দেশ করেছেন। প্রথমত- এই সময়কার রাষ্ট্রিক পরিবর্তন অর্থাৎ ফিউডাল সামন্ততন্ত্রের স্থানে রাজশক্তির আবির্ভাব হয়, দ্বিতীয়ত- ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে হিউম্যানিস্টদের আন্দোলন, তৃতীয়ত- ইউরোপীয় বানিজ্যের বিশাল বিস্তার, চতুর্থত- ইউরোপে পন্যদ্রব্য প্রস্তুত করবার প্রণালীর পরিবর্তন, পঞ্চমত- যাকে মার্কসের ভাষায় পুঁজি সংগ্রহ বলা হয় এবং শেষ বৈশিষ্ট হল পন্য উৎপাদন ও বিনিময় ব্যাবস্থার প্রসার।

সতের শতকে ইংরেজ বিপ্লবের আমলে বিজয়ী প্রজাশক্তি বুর্জোয়া বণিকদের নেতৃত্বে উদারনীতির মতবাদ গড়ে উঠেছিল এর প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রজার প্রতিনিধি সভার চাপে অবাধ রাজশক্তিকে সংকুচিত করে নিয়মের মধ্যে আনা, যার নাম নিয়মতন্ত্র বা কনস্টিটিউশান। ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকান বিপ্লবে উদারনীতির জয় ঘোষিত হয়। ১৭৮৭ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে পৃথিবীর দ্বিতীয় নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যাস্থা প্রবর্তন হয়।

৯) পূর্ণ ধনিকতন্ত্রের সমাজ

নবম অধ্যায়ে সুশোভন সরকার ক্যাপিটালিস্ট সমাজের পূর্ণ রূপ অর্থাৎ ধনিক সমাজের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি ধনিকদের সঙ্গে বণিক বা জমিদারদের বিরোধ দেখা যেত। সমাজের মধ্যে এই স্বার্থরক্ষার লড়াই কৃষক বা শ্রমিক শ্রেণীকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। তিনি আরো বলেছেন- ফরাসী বিপ্লব কথিত বর্জোয়া বিপ্লবের ফলে ফিউডাল শোষন ও কর্তৃত্বের অবসান হয়, কিন্তু আর্থিক উন্নতির জন্য সমাজে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তিনি দেখিয়েছেন ধনিক দেশ গুলির মধ্যে কাড়াকাড়ি যুদ্ধের পর যুদ্ধ নিয়ে আসে,কিছুদিন পর ধনতন্ত্রের মধ্যে দেখা যায় আর্থিক সংকট। যুদ্ধ সংকটের মধ্যে ধনতন্ত্র ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়।

১০) ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা

দশম অধ্যায়ে সুশোভন সরকার মার্কসের ইতিহাসকে দেখার ধরন যা ইতিহাসে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা নামে পরিচিত। যার মূল কথা বিশ্বসংসারে বস্তুর অস্তিত্ব আগে, তার সম্বন্ধে চেতনা পরে, বস্তুর থাকা না থাকা নির্ভর করে মানুষের জ্ঞানের উপর। বিশ্ব সংসারে বস্তুর অস্তিত্বই প্রাথমিক, মানুষের চেতনায় তা প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বিশ্ব সংসারে বিবর্তন ঠিক আকস্মিক নয়, তার নিজস্ব নিয়ম আছে, কারো ইচ্ছা অনুসারে ক্রম্বিকাশের গতি ও লক্ষ্য স্থির হয় না। বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে আছে, সেই বাস্তব জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা প্রকৃতিকে বুঝতে ও কাজে লাগাতে পারি। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে

মার্কসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সমাজের বাইরের চেহারা নির্ভর করে ভিতরের আসল অবস্থার উপর। তিনি সহজ সরলভাবে মার্কসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে আলোচনা করেছেন এবং তিনি নিজেই এর গভীরভাবে আলোচনা করার প্রয়োজনের কথা বলেন।

১১) সমাজতন্ত্রের সূচনা

সূশোভন সরকার শেষ অধ্যায়ে আধুনিক সমাজতন্ত্র গড়ে ওঠার বর্ণণা দেন। তিনি দেখিয়েছেন ধনতন্ত্রের মধ্যে অন্তর্বিরোধের ফলে খন্ড খন্ড ভাবে উৎপাদন বেড়ে চলতে থাকে, এবং উৎপাদনের লাভ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সঞ্চিত হতে থাকে। আধুনিক যন্ত্র ব্যাবস্থার প্রচলনের ফলে মানুষ উৎপাদনের প্রাচীন পদ্ধতি পালটে ফেলতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু তা সম্ভব মালিক শ্রেণীর উচ্ছেদের ফলে, তখন উৎপাদনের সমস্ত উপাদান হবে সাধারনের সম্পত্তি সেই ব্যাবস্থার অপর নাম সমাজতন্ত্র বা সোশালিজম। তিনি দেখিয়েছেন মার্কস এঙ্গেলস সারাজীবন সোশালিজমকে গড়ে তোলবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাদের মৃত্যুর পর লেনিনের নেতৃত্বে ধনতন্ত্র নূতন ভাবে আবির্ভূত হয়, যার নাম ছিল ইম্পিরিয়ালিজম বা সমাজতন্ত্র। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিন সাম্যবাদী দলকে নেতৃত্ব দিতে থাকেন এবং পৃথিবীর প্রথম বিজয়ী শ্রমিক বিপ্লবের পর নূতন সমাজতন্ত্রী সমাজ তার নির্দেশে গড়ে ওঠে। তিনি দেখিয়েছেন মার্কসবাদ আশা করে সমাজবিপ্লব সফল হয়া সম্ভব যদি শ্রমিক শ্রেণী সকল ক্ষমতা হাতে তুলে নেয়, তবেই সমাজের অগ্রগতি সম্ভব।

এইভাবে তিনি ধাপে ধাপে মার্কসবাদী আঙ্গিকে সমাজব্যাবস্থার আদিম পর্যায় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শুরু করে ভারতের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। একটি সমাজের সঙ্গে অন্য সমাজের তুলনা, পার্থ্যক্য, প্রকৃতিগত বিভিন্নতা ইত্যাদির মাধ্যমে ইতিহাসের একটি ক্রমবিবর্তন মূলক ধারা তুলে ধরেছেন। মার্কসবাদকে সহজ সরল ভাবে বোঝার ক্ষেত্রে বইটির তাৎপর্য অসামান্য। কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী ব্যাক্তিদের পথ চলার ক্ষেত্রে বইটি অবশ্যই অপরিহার্য।

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ

আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুন, ১৯৮২।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুশোভন সরকারের পরিচয় ছোটবেলা থেকেই, এ প্রসঙ্গ প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, তবুও গ্রন্থ পর্যালোচনায় আরও কিছু আলোচনার অবকাশ থাকে । তিনি দেখিয়েছেন ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগে কাজ পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ বিদেশে চলে যান। তার আগেই তিনি সুশোভন সরকারের বিবাহ দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু রীতিনীতিগত কারনে তাঁর এই ইচ্ছা পূরন হয়নি। পরে তিনি আগরতলা চলে যান।

১৯২৬ সালে তিনি সদলবলে ইটালি ভ্রমন করেন।তাঁর সম্ভবত মনে হয়েছিল যে, যখন তিনি স্বয়ং মুসোলিনির অতিথি তখন মুসোলিনির শাসনের খারাপ দিকগুলি আলোচনা না করাই ভালো। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও রানী মহলানবিশ ফ্যাসিস্ট শাসনের বর্বরতার দিকগুলি তঁআর কাছে তুলে ধরলেও তিনি ইতালিতে বসে কিছু বলতে চাননি। সরকার লেখেন যে এর ফলে তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

সুশোভন সরকার বিশ্বভারতীর গঠনকাল থেকে শুরু করে আজীবন সভ্য হয়ে ওঠার কথা ব্যাক্ত করেছেন এবং বিশ্বভারতীর পরিচালনায় বেশ খানিকটা অংশ নিয়েছিলেন। সরকার জানিয়েছেন ১৯২৯- ১৯৩২ সময়কাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতেন, সেই সময় প্রতি বছর তিনি ছুটিতে কলকাতা আসতেন। ঢাকাতে রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, যেটি ছিল তার প্রথম ও শেষ আবৃত্তি।

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মের ছুটিতে ‘পরিচয়’ পত্রিকা প্রতিষ্ঠা হয়। সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। পরিচয় প্রতিষ্ঠার পর তারা ঠিক করেছিলেন যে প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা চাওয়া হবেনা, একটা রীতি ছিল কোনো পত্রিকা প্রতিষ্ঠা হলে তার প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা থাক্তেই হবে। অবশ্য পরিচয়ের প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুশি হয়েছিলেন, দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে তাঁর লেখা প্রকাশ হতে থাকে। তারপর তিনি বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে চলে যান। আগে রবীন্দ্রনাথের ইটালী ভ্রমন ও তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব সরকার উল্লেখ করেছেন, তিনি জানিয়েছেন তাদের এই দুঃখ দূর হয় যখন ‘রাশিয়ার চিঠি’ হাতে পেয়েছিলেন। তিনি রাশিয়ার জনগনকে সমর্থন করেছিলেন।

১৯৩৭ সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলকাতা থেকে নীলরতন সরকার ও অন্যান্যরা গিয়েছিলেন তাঁর চিকিৎসা করতে।তিনি সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৪০ সাল নাগাদ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে অনারারি ডকটরেট দিতে শান্তিনিকেতনে স্পেশাল কনভেনশন আহুত হয়, সরকার জানিয়েছেন মঞ্চে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান তআঁর কাছ থেকে গাউন নিয়েছিলেন, যার জন্য তিনি খুব আপ্লুত হয়েছিলেন।

২২ শে শ্রাবণ ১৯৪১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। সুশোভন সরকার অ তার স্ত্রী জোড়াসাঁকোতে গিয়েছিলেন, তখন আর কোনো আশা ছিলনা।

সরকার তার ব্যাক্তিগত খারাপ লাগা ব্যাক্ত করেছেন যখন তিনি দেখেন যে রবীন্দ্রনাথ বেঁচে রয়েছেন অথচ তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য খাট তৈরী হচ্ছে। আসলে রথীন্দ্রনাথ একেবারে অসহায় বোধ করছিলেন। এই অবস্থায় সমস্ত ব্যাবস্থাপনার মূলে ছিলেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। কর্মকর্তারা ঠিক করেন মারা গেলে সূর্যাস্তের আগে দাহ করা বিধেয়।

সুশোভন সরকার দেখিয়েছেন যে যখন রবিন্দ্রনাথের শেষ নিঃশ্বাস পড়ল তখন ভূপতিমোহন সেন তাঁকে ডেকে বলেছিলেন কলেজটা ছুটি করে দিতে । ইতিমধ্যে জোড়াসাঁকোতে জনসাধারনের ভিড় বেড়ে গিয়েছিল। তার সামনে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেহ নিয়ে যাওয়া হল নিমতলা ঘাটে। ভিড়ের মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখতে না পেয়ে দ্রুত নিমতলা ঘাটে চলে গিয়েছিলেন, সেখানেও তিনি ঢুকতে পারেননি।

পুস্তকটি মূলত একটি স্মৃতিলেখ যা সুশোভন সরকার তার ব্যাক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব, তার সঙ্গে কাজে যুক্ত থাকা, পারিবারিক যোগসূত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাক্ত করেছেন। অত্যন্ত সহজ সরলভাবে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষনে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাক্তি স্বত্তাগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। একইসঙ্গে তাঁর সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক, সামাজিক কাজকর্মে জড়িত থাকা ইত্যাদির বর্ণনার মাধ্যমে উভয়ের সামাজিক কাজকর্মের দিক গুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি তার আবেগ, ভালোবাসা, ঘটনার পরম্পরায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রসঙ্গ ইতিহাস

নাভানা, প্রিন্সেপ স্ট্রীট,কলকাতা, জুন ১৯৮৩।

অধ্যাপক সুশোভন সরকারের পরবর্তী গ্রন্থ "প্রসঙ্গ ইতিহাস" নিয়ে আলোচনা করব। সমস্ত বইটি দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত---

১) ইল ফ্যাসিসমো।

২) পার্লামেন্টারি প্রথা।

৩) ইতিহাসে শক্তিলিপ্সা।

৪) ফ্যাসিজমের প্রকৃতি।

৫) টয়েনবির মতামত।

৬) অতীত ও বর্তমান।

৭) যুদ্ধান্তের জগৎ

৮) আলোচনা।

৯) সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস।

১০) বাংলা সাময়িকপত্রে রুশ বিপ্লবের প্রথম দশক।

প্রথম অধ্যায়ে সুশোভন সরকার ফ্যাসিজমের বৈশিষ্টগুলিকে তুলে ধরেছেন। সেক্ষেত্রে তিনি বলেছেন স্থান ভেদে এর চরিত্রের পরিবর্তন ঘটলেও ফ্যাসিজমের একটি বিশিষ্ট রূপ সকল দেশেই বর্তমান। ফ্যাসিসমোর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট হল স্যোসালিজমের বিরুদ্ধাচারন। মুসোলিনি অবশ্য প্রথম জীবনে চরমপন্থী সোস্যালিষ্ট হিসাবেই খ্যাতিলাভ করেন। ইটালী ও জার্মানী উভয় দেশেই সোস্যালিজমের প্রচারের পথ রুদ্ধ করাই ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। ফ্যাসিসমোর বক্তব্য হল- জাতীয় ঐক্যই আদর্শ ও আসল সত্য, এই জাতিগত স্বার্থের মধ্যে শ্রেণী স্বার্থ লোপ পেয়ে সামঞ্জস্যের রূপ গ্রহন করে। নানা জাতীয় আদর্শবাদ বা ভাববাদই ফ্যাসিসমোর অবলম্বন।

ফ্যাসিসমো ব্যাক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে বিশ্বাস করে। গনতন্ত্রের আদর্শের প্রতিবাদ ও উদারনীতি পরিহার ফ্যাসিসমোর দ্বিতীয় বিশেষত্ব, কিন্তু প্রায়ই গনতান্ত্রিক নিয়মপদ্ধতিতে অবহেলা ও অগ্রাহ্য করবার উদাহরন ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে পাওয়া যায়। জনমতের প্রতিনিধি হিসাবে কনো পরিষদের শাসন ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব ফ্যাসিস্টরা স্বীকার করেনা কারন, তাদের মতানুসারে সকল মানুষের সমান ও রাষ্ট্রিক অধিকার এবং সংখ্যাধিক্যের মতে রাজ্য শাসন অন্যায় ও অমঙ্গলজনক,তাতে জাতি বা সমাজের কল্যানের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, আর দেশের প্রকৃত ইষ্টসাধনের জায়গা নেয় নানাবিধ স্বার্থের অনুসন্ধান ও সংঘাত। মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারনা ও প্রতিষ্টানের থেকে এর পার্থক্য প্রফেসর সরকার তুলে ধরেন।

ফ্যাসিস্টরা নেতৃত্বের ধারনায় বিশ্বাস করেন। তাদের এ স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি হল – সকল মানুষ সমান নয়, জাতি ও দেশের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন উপযুক্ত নেতার। এজন্য ইটালিতে মুসোলিনি ও জার্মানিতে হিটলারের উত্থান ঘটে। নেতৃত্বের প্রতিষ্টা নূতন আদর্শদল গঠন, সমগ্রগ্রাসী একাধিপত্য এবং শাসনযন্ত্র সংস্কার এসবের মূল উদ্দেশ্য হল জাতির ঐক্যবিস্তার ও মঙ্গল সাধন। ফ্যাসিস্টরা বলে থাকে যে,যুদ্ধ সত্য সত্যই চিরন্তন তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার উপায় মানুষের নেই,সুশোভন সরকার বলেছেন যোগ্য নেতা সবসময় পাওয়া যাবে কিংবা নানাজাতীয় নানাবিধ লোকের সমষ্টিতে যে দলের গঠন নষ্ট হবেনা একথা অনেকেই বিশ্বাস করেনা। এইসব কারনে তাঁর মনে হয়েছে যে, ফ্যাসিসমো আধুনিক সমস্যার চিরন্তন সমাধান নয়, এমনকি সর্বত্রই যে এ প্রথা গনতন্ত্রের স্থান অধিকার করবে তারও কোনো স্থীরতা নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুশোভন সরকার ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টারি প্রথা আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ইংল্যান্ডের নিয়মতন্ত্রের উদ্ভাবনা ও সাফল্যের কারন নির্দেশ করতে গিয়ে অনেকে জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের আশ্রয় নিয়েছে। ল্যাস্কির মতে ইংল্যান্ডে নিয়মতন্ত্রের সাফল্যের প্রধান কারন হল সে দেশে আর্থিক সুবিধা, সত্তর বছর আগে প্রসিদ্ধ লেখক বেজট তাঁর গ্রন্থে পার্লামেন্টীয় শাসন পদ্ধতির কৃতকার্যতার কারন অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন পার্লামেন্টীয় পদ্ধতির বাহ্যিক প্রকাশের এক প্রধান অঙ্গ হল দল ও পার্টির দ্বন্দ্ব।

ইংল্যান্ড ২৫০ বছর ধরে কখনও উদারবাদী কখনও রক্ষনশীল দল কর্তৃক শাসিত হয়ে এসেছে। নানা বিষয়ে এই দুই দলের মতভেদ ও তীব্র বাদানুবাদ রাষ্ট্রিক ইতিহাসে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। ল্যাস্কি দেখিয়েছেন যে এত প্রভেদ ও মতান্তর সত্ত্বেও এতদিন ধরে উভয় দলের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য থাকাতেই নিয়মতন্ত্র ইংল্যান্ডে টিকে ছিল। শুধু তাই নয় নিয়মতন্ত্রের একটা স্বাভাবিক গতি আছে, উদারনীতিতে এর উৎপত্তি, গনতন্ত্রে এর নায্য পরিনতী। প্রকৃত গনতন্ত্রে নিজেদের মঙ্গল ও অনুসন্ধান করতে বাধ্য। সুশোভন সরকার এক্ষেত্রে বার্নাড শ – এর মন্তব্যকে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছিলেন যে সোস্যালিজমের উদয়ে এক রুদ্ধ প্রশ্ন মূর্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ফ্যাসিস্টদের চাপে সমাজে ভবিষ্যত গড়নের স্বরূপ সম্পর্কিত প্রশ্নকে চাপা দিয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সুশোভন সরকার বিংশ শতাব্দির ইংরেজ মণিষীদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তিত্ব বাট্রান্ড রাসেলের লেখালেখিকে তুলে ধরে ইতিহাসে শক্তি দ্বন্দ্বের তাৎপর্যকে তুলে ধরেছেন। রাসেল ইতিহাসের মূলসূত্র খুঁজেছেন মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে। বিশেষত যে প্রবৃত্তিগুলি মানুষকে অন্য বস্তুর থেকে পৃথক করে রেখেছে। মানুষের বহু ইচ্ছার বৈশিষ্ট্যই নাকি তাদের অসীমতা, এই সীমাহীন আকাঙ্ক্ষাগুলির মধ্যে পাওয়ার বা শক্তিলিপ্সাকে রাসেল বেছে নিয়েছেন ইতিহাসের মূল প্রেরনা হিসাবে।

সুশোভন সরকার দেখিয়েছেন যে শক্তির আকাঙ্ক্ষাকে মানুষের কল্যানে লাগাতে হলে অবশ্য কতকগুলি ব্যাবস্থার প্রয়োজন। যেমন- রাষ্ট্রের মধ্যে চাই গনতন্ত্র এবং ব্যাক্তিগত স্বাধীনতা, বিভিন্ন মতপ্রচার এবং শাসকদের পূর্ণ সমালোচনার অধিকার সেই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে। আর্থিক ব্যাবস্থায় সোস্যালিজমে রাসেলের আপত্তি নেই, কিন্তু তার মধ্যে কোন প্রকার ডিকটেটরি কর্তৃত্ব সাময়িকভাবে অগ্রাহ্য।

একইসঙ্গে প্রফেসর সরকার রাসেলের মতের সমালোচনাগুলিকেও তুলে ধরেছেন। রাসেল সমাজের নানা অবস্থার চিত্র এঁকেছেন মাত্র; সামাজিক পরিবর্তনের কোন ধারয়ার নির্দেশ, যুগ থেকে যুগান্তরে আসবার কোনও কারন নির্ণয় থেকে তিনি নীরব থেকেছেন। এ অবস্থায় তার থিওরিকে ব্যাপক ব্যাখ্যা হিসাবে দাবি করার কোন কারন নেই বলে সুশোভন সরকার মনে করেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে সূশোভন সরকার ফ্যাসিজমের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে ফরাসী বিপ্লবের যুগে ইউরোপে এক নতুন আর্থিক ব্যাবস্থা যুক্ত হয়, যার নাম ক্যাপিটালিজম বা ধনতন্ত্র নামে খ্যাত। সুশভন সরকার ধনতন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, যেমন তিনি দেখিয়েছেন ধনতন্ত্রের যুগে প্রথম দিকে সাধারন নিয়ম ছিল দেশে দেশে অবাধ বানিজ্য ও দেশের ভিতর মালিকদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা, কিন্তু ক্রমে আরথিক অবস্থা বদলাতে শুরু করে এবং ইম্পিরিয়ালিজমের আকার নেয়। এর ফলে দেখা যায় শক্তিশালী কয়েকটি দেশ পরস্পরের মধ্যে রেশারেশি চালায়, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আকার নেয়।

এই বিপদগুলিকে আটকাবার জন্যই ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি। তাই যে সব দেশে নানা কারনে পুরানো মালিকি ব্যাবস্থা সবচেয়ে বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ে সেই সব অঞ্চলেই প্রথম ফ্যাসিস্টের আবির্ভাব হয়। ছলে বলে কৌশলে সাধারন মানুষকে ভুলিয়ে রাখা এর উদ্দেশ্য।

সুশোভন সরকার ভবিষ্যতে আশা রাখেন যে, জনযুদ্ধ হচ্ছে সেই আগুন যা ফ্যাসিস্ট দেশগুলিতে চাপা থাকা অসন্তোষগুলিকে বের করে দাবানলের আকার নেবে। লোক ভোলানোর মিথ্যার ওপর গড়া ফ্যাসিস্ট ইমারত তখন ধুলিসাৎ হবে, সমস্ত পৃথিবীর চেহারা বদলে যাবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে সুশোভন সরকার টয়েনবির মতামতকে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন বহুকাল ধরে খন্ডিত ইতিহাসের ধারনাকে টয়েনবি বদলে দিয়েছেন। ইতিহাসকে সমগ্রভাবে দেখার ভাবনা তার লেখায় ফুটে উঠেছে। সভ্যতা মূলত এক একথা ট্যেনবি খন্ডন করেছেন। জন্মের পর বিকাশ বা বৃদ্ধি সভ্যসমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এছাড়া এক সমস্যা থেকে অন্য সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার শক্তি, সমন্বয় সার্থকতা জীবনের পরিচয়। তাঁর মতে সভ্য সমাজ যতদিন এইপথে এগিয়ে চলবে ততই তার জীবনীশক্তি বেড়ে জায়। সমালোচকদের মতে তার লেখায় মাঝে মাঝে কল্পনার আভাস পাওয়া যায়। তবুও বলা যায়।ইতিহাসকে কৌতুহলী করতে তাঁর লেখা অনস্বীকার্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সুশোভন সরকার একটি ইংরেজী পত্রিকা-"অতীত ও বর্তমান" নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইংল্যান্ডের ইতিহাস আলোচনাকে কেন্দ্র করে পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে। সাধারন দৃষ্টির আলোতে নানা যুগের ইতিহাসে অনেক প্রশ্ন মূর্ত হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ উত্তরের চাইতে প্রশ্নগুলির উপস্থাপনাতেই পত্রিকার বিশেষত্ব চোখে পড়ে। এখানে অনেক অতীতের সন্ধিক্ষন নিয়ে আলোচিত হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে বুর্জোয়া বিপ্লবের পূর্ণ পরিণতি ছিল ফরাসী বিপ্লব, এর প্রভাব পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে বিস্তার লাভ করে। একইসঙ্গে একথাও বলেছে যে, যুদ্ধের পর শান্তিরক্ষার উপায় কি হতে পারে, একদিকে ধনতন্ত্র ও অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের উপস্থিতি প্রগতিবাদকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। সেজন্য সকল দেশের জনসাধারনের স্বার্থকে কি উপায়ে রক্ষা করে চলতে হবে- সে বিষয়ে মধ্যবিত্তকে দৃষ্টি আকর্ষন করতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়ে সুশোভন সরকার যুদ্ধান্তের শেষে ফ্যাসিবাদী শক্তির উদ্যত প্রাসাদকে ধুলিসাৎ করার মানসিকতাগুলিকে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী ও ইটালীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আসন্ন মনে হওয়ায় তার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া রুপে ফ্যাসিবাদ আত্মপ্রকাশ করে। ধনিকদের সমর্থনেই সে আন্দোলন পুষ্টিলাভ করে। ইংল্যান্ডে ফ্যাসিবাদকে নিন্দা করা হলেও বলা জায় যে ফ্যাসিস্ট মনোভাবকে পশ্রয় দেওয়াটা ছিল ইংরেজ নেতা চেম্বারলেনের আপোস নীতি।

প্রগতিবাদীরা ফ্যাসিবাদী শক্তিকে সমূলে উৎপাটিত করা প্রধান কর্তব্য বলে মনে করে। নাৎসী নীতিকে ধ্বংস করতে পারলে পৃথিবীর জনসাধারনের তথা জার্মানীর জনসাধারনের মঙ্গল বলে তারা মনে করে। তাই তারা নাৎসি নেতাদের শাস্তির দাবি

জানিয়েছে। প্রগতিবাদীদের সংগে শিক্ষিত সমাজের একই ভাবনাক সুশোভন সরকার তুলে ধরেছেন।

অষ্টম অধ্যায়ে অন্যান্য আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ঐতিহাসিক রমেশ্চন্দ্র মজুমদারের ইতিহাস লেখার ধরনকে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ডঃ রমেশ্চন্দ্র মজুমদার ছিলেন একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক, তাঁর প্রত্যেকটি বক্তব্য আমাদের শ্রদ্ধার যোগ্য। প্রফেসর সরকার দেখিয়েছেন যে তথ্য সংগ্রহ ইতিহাসে মূল বিষয়, এইদিকে রমেশচন্দ্র মজুমদার খুব সাবধানে আকর তথ্য সংগ্রহ করতেন, ফলে এর সত্যতা নিয়ে কোন মতান্তর থাকতনা। এরপর খুব সাবধানে তা তিনি বিশ্লেষন করতেন। সুশোভন সরকার রমেশচন্দ্র মজুমদারের দুটি সিদ্ধান্তকে আলোচনা করেছেন, প্রথমত- ভারতে মুসলমান রাজত্ব বিদেশী শাসন কারন হিন্দুদের উপর সমানে অত্যাচার চলে আর সে অত্যাচার সম্বন্ধে হিন্দুরা সর্বদাই সজাগ ছিল। দ্বিতীয়ত- ভারতে হিন্দু মুসলমান বিরোধ বরাবরই ছিল। কিন্তু এই বিরোধই যে শেষ কথআ এ কথ বলা যায় না, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ ছিল আর সেখান থেকেই এই বিরোধের সৃষ্টি। আবার দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাবকে অস্বীকার করা যায়না।

নবম অধ্যায়ে সুশোভন সরকার রমেশচন্দ্র মজুমদারের সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। সরকার দেখিয়েছেন রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা অন্য ধরনের। ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে সিপাহী যুদ্ধের কারন, প্রকৃতি ও

ফলাফল নূতন পর্যালোচনা তাঁর লক্ষ্য। "১৮৫৭" গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখা হয়েছে-' আজ পর্যন্ত এই সংঘর্ষের কোনও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা হয়নি', এখন তার আলোচনা প্রয়োজন। এই গ্রন্থের বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় সাম্প্রদায়িক ঘটনাগুলি থেকে বিচ্যুতি। কিন্তু বাস্তবে তা হয়েছিল। এই গ্রন্থে বিদ্রোহে সাধারন মানুষের জড়িয়ে পড়ার বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। ডঃ মজুমদার বলেছেন যে ১৮৫৭ সালে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের কোন কথাই উঠতে পারেনা, সেক্ষখেত্রে বলা যায়, সে সময়ে প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদের অস্তিত্বএর অভাব চোখে পড়ার মত।

মহাবিদ্রোহের মধ্যে ফিউডাল ধ্যান ধারনার অস্তিত্ব সহজেই লক্ষ্যনীয়। তার পরিচয় সরকার দিয়েছেন মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, স্থানীয় অভিজাত নেতার প্রতি আনুগত্য, অরাজক বিশৃঙ্খলার আভাস, পশ্চিমী সংস্কারচেষ্টার প্রতিকূলতা ইত্যাদির ভিতর। সেই কারনে বিদ্রোহকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করা অসংগত। সুশোভন সরকার দেখিয়েছেন যে বিদেশি শৃঙ্খল থেকে মুক্তি এবং শাসনব্যাবস্থাকে বহু লোক অত্যাচার মনে করে তার উচ্ছেদ- বিদ্রোহের এই সাধারন লক্ষ্যকে সেদিনের অবস্থায় কিছুতেই ফিউডাল প্রতিক্রিয়া আখ্যা দেওয়া যায়না।

শেষ অধ্যায়ে তিনি সমসাময়িক বাংলা পত্র পত্রিকায় রুশ বিপ্লবের প্রথম দশকের প্রতিফলন ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কিছু ইংরেজি ও বাংলা পত্র পত্রিকার নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন 'হিন্দুস্থান রিভিউ' ১৯২২ এর জানুয়ারিতে ম্যাক্সিম গর্কির এক গল্পের

অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯২২ এর মে মাসে ছাপা হয়েছিল সোভিয়েট বিপ্লব ও বিশেষ করে নূতন নেপ নিতীর আলোচনা। এরপর 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকা রুশ বিপ্লবের পরের বছর "রুশ রাষ্ট্রকে স্বিকৃতি দিতেই হবে" প্রবন্ধটি প্রকাশ করে। বিপ্লবের দশ দিন পর 'দৈনিক বসুমতি' ঘোষনা করে সাম্যবাদের আসল বাহক হল বলশেভিকরা। হিন্দি পত্রিকা ' বিশ্বমিত্র' লেখে ব্রিটিশ নেতারা জনমত উপেক্ষা করে রুশ দেশে অভিযান চালাচ্ছে। বাংলা সাময়িক পত্রিকা 'প্রবাসী' তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সোভিয়েত দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর জীবন আলেখ্য (মার্চ ১৯২৪) সবচেয়ে স্মরনীয়। এগুলি ছাড়াও প্রফেসর সরকার অন্যান্য বেশ কিছু পত্র পত্রিকার নাম উল্লেখ করেছেন যেখানে বলশেভিকদের আন্দোলন সেই সঙ্গে লেনিনের অবদান কে তুলে ধরেছেন। যেমন- 'সৎসঙ্গী', ফণীভূষণ ঘোষের 'লেনিন'(১৯২১), প্রিয়নাথ গাঙ্গুলির 'লেনিন ও সোভিয়েত'(১৯২২), প্রিয়কুমার গোস্বামির 'স্বাধীনতার স্বরাজ'(১৯২৩) ইত্যাদি। এছাড়া "রুশিয়া"(১৯২৫) ও "সমাজতন্ত্র"(১৯২৫-২৬) গ্রন্থ দুটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৯

সুশোভন সরকার এই গ্রন্থে ১৯১৪-১৯১৮ সাল পর্যন্ত চলা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের অবস্থা আলোচনা করেছেন। লক্ষ্য লক্ষ্য প্রাননাশের পর ইউরোপের নানা দেশে বহু পরিবর্তন আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য মূলত জার্মানিকে দায়ী করা হয়ে তার উপর শর্তের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম অধ্যায়ে সরকার যুদ্ধের বাতাবরন সৃষ্টির কথা আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যুদ্ধ শেষে শান্তিস্থাপনের প্রয়াসকে দেখানো হয়েছে। ন্যায়ের আদর্শ নিয়ে প্রেসিডেন্ট উইলসন উপস্থিত হলেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বার্থ সুলভ মনোভাবের ফলে কিভাবে জার্মানিকে অপদস্ত করা যায় সেই নিয়েই রাষ্ট্রগুলি ব্যাস্ত ছিল।

প্রশান্ত মহাসাগরে শক্তি সংঘাত এবং নব্য তুরস্কের অভ্যুত্থান এখানে আলোচ্য। মহাযুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপত্তি খুবই বেড়ে যায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সরকার দেখিয়েছেন ১৯১৮ সালের শেষে তুরস্ক দুর্ভাগ্যের চরমে পৌছেছিল। যুদ্ধান্তের ম্যান্ডেট প্রথাও তুরস্কের মতন ইউরোপীয় ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও তার অন্তরঙ্গ অংশ নয়।

সপ্তম অধ্যায়ে মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্মের আশ্রয় সমগ্র ইউরোপকে যেভাবে বেঁধে রেখেছিল তার লোপ পায়। তিনি দেখিয়েছেন বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ কে কার্য্যকরী হতে গেলে তাকে অবশ্য অনেকখানি বিশ্বরাষ্ট্রের আকার ধারন করতে হবে। তিনি বলেছেন বিশ্বরাষ্ট্রের ব্যার্থতা নিয়ে সকলে আলোচনা করেছেন কিন্তু এর সফল না হওয়ার কারন নিয়ে কেউ আলোচনা করেনি। এর আংশীক

সাফল্য অবশ্যই ছিল যুদ্ধের পর সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের বিষয়টি নিষিত করতে পেরেছিল। সকল রাষ্ট্রকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে সক্ষ হয়েছিল।

অস্টম অধ্যায়ে তিনি মূলত মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের সাম্যবাদী দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন। নবম অধ্যায়ে তিনি জাপানের হাতে পরাজয়ের পর রাশিয়া তুমুল আন্দোলনের স্বীকার হয়। নানা দলের মিলিত চাপে তখন সম্রাট বাধ্য হয়ে নিয়মতন্ত্র অঙ্গীকার করতে হয়। প্রতিনিধি সভা এভাবে স্থাপিত হলেও বিশ্বযুদ্ধের পর জার তন্ত্রের অক্ষমতা বার বার প্রকাশ পায়। সংস্কারের দাবিতে বারবার আন্দোলন হতে থাকে। যার পরিনতি ছিল রূশ বিপ্লব। ফলে রাশীয়ায় নঅতুন আর্থিক ব্যাবস্থা সূচিত হয়।

পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে সুশভন সরকার ইটালিতে মুশোলিনির আবির্ভাব, জার্মানিতে হিটলারের আগমন, প্রাশিয়াতে বিসমার্কের উত্থান ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন। তিনি সবশেষে বলেছেন ইতিহাসের গতি পর্য্যবেক্ষন করলে মনে হয়না যে বামপন্থার অবসান হবে। ফ্যাসিস্ট শক্তি বাধা মনে হতে পারে। ফ্যাসিস্ট নেতৃত্ব দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভবনা কম, তবে আর্থিক বিরোধ চিরন্তনী না হলে সোভিয়েত রাশিয়ার সাফল্যের উপর মানবসমাজের ভবিষ্যত অনেকখানি নির্ভর করে।

ইতিহাস চর্চা

নবার্ক, কলকাতা -৫৯, আশ্বিন ১৩৯২

এই গ্রন্থে মূলত সরকার ফ্যাসিবাদী মতাদর্শ ও সেখান থেকে মহাযুদ্ধের আশঙ্কা নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে চেক সমস্যা, এছাড়া বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আন্দোলনের সতর্কতা ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন। তিনি ইউরোপীয় সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ক্ষেত্রেও এই দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন। ১৩ টি অধ্যায়ে বিস্তৃত গ্রন্থটিতে মূলত ফ্যাসিবাদী শক্তি ও তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংঘাত এগুলি আলোচিত হয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় হিন্দু মহাসভার মূল নেতা সাভারকারের সঙ্গে জহরলাল নেহেরুর মতবিরোধ।

তিনি দেখিয়েছেন আসন্ন শ্রমিক বিপ্লবের বিপদ থেকে রক্ষা করার উপায় হিসাবে ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটেছে। এর সাফল্য যতই হোক না কেন অন্তর্নিহিত পরিনামে ধনতন্ত্রের পক্ষে উভয় সংকট সূচিত হচ্ছে। আভ্যন্তরীন চাপের ফলে ফ্যাসিস্ট ধনতন্ত্রের পতন বা পরিবর্তন সম্ভব। দেশের রাষ্ট্রিক চেতনা যে প্রবাহিত হচ্ছে তার দিকে সরকার দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন। দেশের আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার নিশ্চিত করতে তিনি তৎপর ছিলেন। তিনি তার লেখনির মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রগুলির বাড়বাড়ন্তকে তুলে ধরেছেন ও তার পতনের কথাও তিনি বলেছেন।

“Towards Marks” & “Marxian Glimpse of History”

Papyrus, Calcutta 700004,1983

গ্রন্থ দুটিতে মূলত মার্কসবাদ কে নিয়েই আলচনা হয়েছে, সরকার এখানে গ্রামশীর ভাবধারাকে তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের ধারা গ্রন্থটিতে এ প্রসঙ্গে বিস্তর আলোচনার পর সাময়িক আলোচনার অবকাশ থাকে। মার্কস ও এঙ্গেলস একটি সমাজবাদী ভাবধারা আনেন, যেখানে শ্রমিক আন্দোলনের কথা বলেন, তারা আশা করেন যে শ্রমিক শ্রেনীর হাত ধরে সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। তারাই ক্ষমতা দখল করবে ও শ্রেণী সংগ্রামের অবসান ঘটবে।

পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহ

রুশ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত

পরিচয়, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা মাঘ-১৩৩৮,

প্রফেসর সরকার দেখান যে ১৮৪৭ সালের সাম্যবাদের ঘোষনাপত্রে মার্কস্ বিভিন্ন দেশের শ্রমিক দিগকে একতার জন্য অনুরোধ করেন। ১৮৬৪ সালে তাঁর নেতৃত্বে লন্ডন নগরে প্রথম সার্বভৌমিক শ্রমিক সংঘ স্থাপিত হয়। ১৮৮৯ সালে দ্বিতীয় এবং

রুশ বিপ্লবের পর তৃতীয় শ্রমিক সংঘ স্থাপিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত সাম্যবাদী দলগুলিকে বলশেভিকদের নেতৃত্বে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

সরকার দেখিয়েছেন যে বিপ্লবের পর সাম্রাজ্য ভেঙে নতুন নতুন স্বাধীন রাজ্যগুলির উদ্ভব হয়। ১৯২৩ সালে বলশেভিকদের প্রচেষ্টায় বিরাট সংহত রাষ্ট্রের সূচনা হয়। সাতটি ভিন্ন ভিন্ন সোভিয়েত রাষ্ট্র এক হয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। সোভিয়েত শাসন পদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য।নগরে নগরে ও পল্লী সমূহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোভিয়েত আছে । সোভিয়েত কংগ্রেস একটি কেন্দ্রীয় সমিতি নির্বাচন করে তার হাতে রাজ্যভার অর্পন করে।

সোভিয়েত ব্যাবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে জনসাধারনের ভোটে অধিকার আছে অথচ ধনীদের নেই। যারা মজুর খাটায়, সুদভোগ করে, পৌরহিত্য করে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার নেই। পল্লিগ্রামে সোভিয়েত গঠন, জেলা সোভিয়েত কৃষি পদ্ধতির প্রসার এসব সত্ত্বেও বলশেভিক্রা সমালোচিত হয়, কিন্তু জনসাধারনের উন্নতির জন্য এইরূপ পরিশ্রম ও চেষ্টা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

জার্মানির দুরাবস্থা

পরিচয়, ৩য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ- ১৩৪০ পৃ-৪১

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি দলের উত্থান হয়। হিটলারের ব্যাক্তিত্ব, তার দল গঠনের কৌশল ইত্যাদির সঙ্গে আন্তর্জাতিক কিছু পরিস্থিতি জার্মানির অবস্থাকে খারাপ করে তুলেছিল। প্রফেসর সরকার দেখিয়েছেন ভার্সাই সন্ধির পর জার্মানির প্রতি অবিচার করা হয়, প্রেসিডেন্ট উইলসন শান্তি স্থাপনের আদর্শ প্রচার করলেও অধিক লোভ, রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির ফলে জার্মানিকে প্রতি পদে হেনস্থা হতে হত।

সন্ধিতে একের পর এক ক্ষতি জার্মানিকে মেনে নিতে হয়। সেভাবেই তার সীমা নির্ধারন করা হয়। বানিজ্যের মূল কেন্দ্রস্থলগুলি হস্তচ্যুত হয়।তার যাবতীয় সামরিক শক্তি শেষ করে দিয়ে বিরাট অঙ্কের ঋণের বোঝা চাপানো হয় যেখান থেকে বেরিয়ে আসা জার্মানির পক্ষে সম্ভব ছিলনা। যুদ্ধের পর যেখানে অন্য দেশের আরথিক অবস্থা ফিরে আসছিল তখন আর্থক দুরাবস্থায় জর্জরিত জার্মানির অবস্থা ক্ষতিপূরনের চাপে অসহনীয় হয়ে উঠছিল। ১৯২৯ সালের মহামন্দার ফলে আমেরিকার কাছ থেকে জার্মানির আর্থিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যায় । সরকার দেখিয়েছেন যে ক্রমে শ্রমিকদের মধ্যে নৈরাশ্য ক্ষোভ , দুশ্চিন্তা, হতাশা বৃদ্ধি পায়। জার্মানির অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পরে।

A Study of History: By Arnold J Toynbee,Vol-I,II and III(Oxford University Press)

পরিচয়, ৫ম বর্ষ ১৩৪২

সুশোভন সরকার টয়েনবির রচনাকে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন টয়েনবি উত্তর সামরিক যুগের লেখক, অন্যান্য রচনার তুলনায় সভ্যতার সূত্রপাত থেকে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাসের পর্যালোচনা এবং সে সম্বন্ধে বিশাল গ্রন্থ প্রনয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য এবং এই রচনায় তিনি তাঁর নিজের জীবন নিয়োগ করেছিলেন। সভ্যতার এই বিশ্লেষন তেরো ভাগে সম্পূর্ন হবে যার মধ্যে তিনটি অংশ প্রকাশিত হয়েছে। সরকার দেখিয়েছেন ইতিহসের খন্ড খন্ড রূপ থেকে সরে এসে টয়েনবি মানব ইতিহাসের সামগ্রিক রূপ রচনা করেছেন।

টয়েনবি বলতেন ব্যাক্তি বিশেষের মত সমাজেরও জন্ম, বৃদ্ধি, বার্ধক্য ও মৃত্যু আছে। বিভিন্ন সমাজগুলির সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টায় টয়েনবি প্রভূত পরিশ্রম করেছেন। এর মধ্যে মিশরী ও আন্ডেশ সভ্যতার সঙ্গে পূর্বগামী বা পরবর্তী কোন সভ্যতার যোগ তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেছেন একটি সভ্যতা গড়ে ওঠার মূলে থাকে পূর্ববর্তী বা অন্যান্য সভ্যতার প্রভাব। সভ্যতার বৈশিষ্ট্য হল অগ্রগতি।

টয়েনবি ইতিহাস সম্বন্ধে বিশ্বাসের যে সামান্য পরিচয় সুশভন সরকার দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে টয়েনবির প্রত কথাতেই প্রতিবাদ করা যায় । টয়েনবির প্রধান দোষ হয়তো ঐতিহাসিক সাদৃশ্যের অনুসন্ধান। লেখার কৌশল ইতিহাসের এক

অভিনব রূপ তার রচনায় পাওয়া যায়। তার গ্রন্থের পাঠক মাত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতুহল বাড়তে বাধ্য। এ জন্য টয়েনবি ইতিহাসের সকল ছাত্রছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত গর্বের।

ফরাসী ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক

পরিচয়, বর্ষ-৩২, সংখ্যা- ৩, শ্রাবণ-পৌষ-১৩৬৯।

সরকার দেখিয়েছেন যে মার্ক ব্লক পশ্চিমী ইতিহাসে সু পরিচিত হলেও সমসাময়িক সময়ে ভারতে তিনি অপরিচিত ছিলেন। ইউরোপ সম্প্ররকে তার রচনা খ্যাতি অর্জন করলেও তখনও পর্যন্ত মাত্র তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার ফলে অনেকের কাছে তিনি অপরিচিত থেকে গেছেন। ব্লকের প্রথম বই "আইল দ্যা ফ্রাঁস"(১৯০৩), প্যারিস সংলগ্ন অঞ্চলের ইতিহাস,ক্যাপেট যুগের আলোচনা- "রাজা ও ভূমিদাস"(১৯২০), মধ্যযুগের রাজাদের বিষয়ে অলৌকিক বিশ্লেষন-" রাজকীয় স্পর্শ মাহাত্ম"(১৯২৪) ইত্যাদি। ব্লকের প্রসিদ্ধতম সৃষ্টি "ফিউডাল সমাজ"।

১৮৮৬ সালের ৬জুলাই ব্লক জন্মেছিলেন ১৯৪৪ সালে তিনি মারা যান। তিনি শুধু বড় ঐতিহাসিক ছিলেন না একজন আদর্শবাদী ও দেশপ্রেমী হিসাবেও তার অবদান স্মরনীয়। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করা ব্লকের এক মহান কীর্তি। তিনি বলতেন যে

সরকারী দপ্তর ও দলিল যথেষ্ট নয়, মানুষের অতীত কার্যকলাপের সবকিছু থেকেই ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। ইতিহাস চলমান বিদ্যা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্লকের আস্থা ছিল সুগভীর।

মূল্যবিচার সম্পর্কে ব্লকের দৃঢ় অভিমত ছিল যে ঐতিহাসিক কখনও বিচারক হবেন না, তার কাজ হল ঘটনার ব্যাখ্যা মাত্র, ভালো মন্দ বলার অধিকার তিনি দাবী করতে পারেন না, তৎকালীন উদ্দেশ্য সফল কি ব্যার্থ হল এইটুকুই তিনি বলবেন। ইতিহাস্অকে বোঝাই আসল উদ্দেশ্য। সরকার ব্লকের সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে মন্তেস্কু ফিউডাল প্রথাকে ইউরোপের নিজস্ব বলেছেন। ভলতেয়ার বলেছিলেন ফিউডাল ব্যাবস্থা নানা দেশে নানাভাবে দেখা গিয়েছিল। ব্লক দ্বিতীয় মতটি স্বীকার করে নিয়ে দেখিয়েছেন যে জাপানে ফিউডাল ব্যাবস্থা বর্তমান ছিল আর অন্যত্র ছিল তা বিচার সাপেক্ষ। ফিউডাল ব্যাবস্থার আসল বৈশিষ্ট্য এই যে এতে উৎপাদক দাস না হলেও উদ্বৃত্ত সম্পদ তার হাতছাড়া হয় আর্থিক লেনদেনের আওতার বাইরে। তাই ফিউডাল সমাজকে পাঁচটি শতাব্দিতে আবদ্ধ না রাখাটাই যুক্তি সঙ্গত বলে সরকার মনে করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

ঐতিহাসিক রূপে সুশোভন সরকার

চতুর্থ অধ্যায়ে সুশোভন সরকারের ইতিহাস দর্শনকে আলোচনা করব। সুশোভন সরকার নিজেকে পেশাদারি ঐতিহাসিক বলে মনে করতেন না, ব্যাক্তিনিরপেক্ষ তথ্য সংগ্রহকে তিনি ইতিহাস বলতে রাজি ছিলেন না, অর্থাৎ অসংখ্য ফ্যাক্টের একত্রীকরন ইতিহাস নয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস, ‘ এই খন্ড খন্ড সত্য নিয়ে মানুষের মন তৃপ্তি পায় না, এতে আবদ্ধ থাকলে ইতিহাস নিতান্ত নিরস ও অনেকাংশে নিরর্থক হয়ে পড়ে। তাই অইতিহাসিক তাঁর বিদ্যাকে একটা

উচ্চতর স্তরে তুলতে চেষ্টা করেন- সে ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্বন্ধ- সূত্রের মালায় ভিন্ন ঘটনাকে গ্রথিত করার উদ্যমই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। লক্ষ্যনীয় যে তিনি উনিশ শতকের র‍্যাঙ্কে, অ্যাকটন প্রমুখ ঐতিহাসিকদের সর্বজন গ্রাহ্য ইতিহাস ধারনা মান্য করেন না। কারন প্রথম থেকেই তিনি জানেন বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রনালী ইতিহাসচর্চার দ্বিতীয় স্তরে প্রায় অচল এবং ইতিহাস লেখকের পক্ষে একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে বিজ্ঞানসম্মত নিরপেক্ষতায় পৌঁছানো দুঃসাধ্য। অথচ ব্যাখ্যা ব্যাতীত ইতিহাস কিংবা অন্য জ্ঞানান্বেষনকে ঠীক বিদ্যার পর্যায়ে ফেলা চলে না। একথাটাই সুশোভন সরকার সারাজীবন নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন—

১) সমস্ত সমাজ বা জাতির ক্রমবিকাশের কথাই হল ইতিহাসের সারমর্ম।

২) সমাজের জীবন একটা স্রোতের প্রবাহের মতন, তাহার নিজস্ব গতির রূপটীকে ফুটিয়ে তোলাই ঐতিহাসিকের কাজ।

৩) কোনও যুগকে বোঝবার চেষ্টাই সেই যুগের ইতিহাস, ব্যাক্তিবিশেষের কীর্তি বা অপকীর্তির সন্ধান তার একটা অংশ মাত্র।

তথ্য বা ফ্যাক্টকে তিনি গুরুত্ব দিতেন বেশি, অল্প পরিসরে নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনায় বেশি আগ্রহী ছিলেন। তিনি বলেছেন ইতিহাসের সমগ্র মূর্তি প্রকাশ পায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে, আর সে দৃষ্টিভঙ্গি শ্রেণী, জাতি বা ব্যাক্তিগত পার্থক্য ও যুগধর্মের বৈশিষ্ট্যের উপর গড়ে ওঠে। তিনি বলেছেন তথ্য বা ঘটনার ব্যাখ্যার মধ্যে ঐতিহাসিকের নিজস্ব দৃষ্টি ধরা পড়ে- ব্যাখ্যা ছাড়া ইতিহাস কিংবা অন্য অনুরূপ জ্ঞানান্বেষণকে ঠিক বিদ্যার পর্যায়ে ফেলা

যায়না। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ইতিহাস রচনার প্রয়াস নিয়ে আলোচনার সময় সুশোভন সরকার এই মতাদর্শকে তুলে ধরেছিলেন।

মার্ক ব্লখের ইতিহাসদৃষ্টির ব্যাখ্যায় তিনি ইতিহাস-লেখকের নির্বাচন, সামান্যিকরণ ও মূল্যায়নের কথা বলেন। সুশোভন সরকারের ইতিহাস দর্শনের পরিচয় পাই তাঁর লেখালেখিগুলির মধ্যে। তাঁর অসামান্য রচনা "বাংলার রেনেসাঁস" এক্ষেত্রে উদাহরন সাপেক্ষ। গ্রন্থটি নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়েছে। প্রকৃত মতভেদের জন্ম উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরন সম্বন্ধে বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের ধারনায়। এর পিছনে ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁস সম্বন্ধে সে দেশেও ভিন্ন ভিন্ন ধারনা বা ধারনার রূপান্তর। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'নতুন কোন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, ইউরোপেও ব্যাবহার হয়েছে রেনেসাঁস শব্দটি। সুশোভন সরকার যখন লেখেন তখন প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নবজাগরনের পরিচয় তিনি দেন। তথ্যের বিন্যাসে নিজের বিশেষ রীতি প্রকরণ ব্যাবহার করেছেন। লক্ষ্যনীয় যে গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রনের সময় তিনি কোনও সংশোধন-সংযোজনের প্রয়োজন বোধ করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরন (১৯৬১) প্রবন্ধটিতে বাংলার রেনেসাঁস নিয়ে তার দীর্ঘদিনের ভাবনার রূপরেখা পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন- ইউরোপের পনেরো-ষোলো শতকের রেনেসাঁসের সঙ্গে বাংলার নবজাগরন তুলনীয় নয়, ইউরোপ ও বাংলার রাষ্ট্রিক পরিবেষ্টন স্বতন্ত্র। "আমাদের জাগরন এল বিদেশীর পদাশ্রয়ে"। বাংলার রেনেসাঁসের উন্মেষক প্রেরণা এসেছিল সেকালের ভারত থেকে নয়, একালের নবজাগ্রত পশ্চিম

থেকে। বাংলার রেনেসাঁসকে দেখা হয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অগ্রগতি হিসাবে, চিন্তা ও উদ্যমের কাহিনি হিসাবে, সর্বাঙ্গীণ জাগরনের নিদর্শন হিসাবে, দেশের নবজন্মের প্রতীক হিসাবে।

লেখকের অন্যান্য রচনাগুলিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন "ইতিহাসের ধারা" গ্রন্থটি সম্পূর্ন কমিউনিস্ট কর্মীদের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও মার্কসবাদী দর্শন এবং তাকে কেন্দ্র করে সমাজের আদিম অবস্থা থেকে আধুনিক সমাজে উত্তরন অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। এর অন্তদর্শন মূলত মার্কস ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রিক। সমাজের আধুনিকতার উত্তরনে অর্থনীতির সদর্থক ভূমিকা, ও সেই প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশ গুলির আধুনিক সভ্য সমাজে রূপান্তরের পর্যায়গুলি ক্রমান্বয়ে সাজানো হয়েছে।

'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটিতে তিনি তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়, ব্যাক্তিগত জীবনে তাঁর হস্তক্ষেপ তাঁর সঙ্গে কাটানো দীর্ঘসময়, একসঙ্গে বিশ্বভারতীর সাংগঠনিক কাজে যুক্ত থাকা, এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। মৃদুভাষী একজন ব্যাক্তির আবেগ, ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায় গ্রন্থটিতে। তিনি একদিকে যেমন একজন সুদৃঢ় বক্তা ছিলেন, তেমনই অন্যদিকে আবেগপ্রবনও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি ভালোবাসা সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

‘প্রসঙ্গ ইতিহাস’ গ্রন্থটিতে দেখা যায়- ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য, সমাজে তার প্রভাব ও ফ্যাসিবাদী ভাবধারা নিশ্চিহ্ন হওয়ার পন্থা ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অত্যন্ত সহজ সরলভাবে ফ্যাসিবাদেরর কুপ্রভাবগুলিকে তুলে ধরেছেন। সুচারু বক্তব্যের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যুদ্ধ কোন জাতির ভবিষ্যত হতে পারেনা। তার দৃঢ় মনোভাব, বলিষ্ট বক্তব্যের জন্যই তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজের বক্তব্যকে জোর দিয়ে বলতেন সমালোচনা করলেও তার মতামতকে খন্ডন করতে পারতেন না সমালোচকগন।

তাঁর ‘ইতিহাস চর্চা’ রচনায় আধুনিক অর্থনীতির সঙ্গে সোস্যালিজমের প্রভাবকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন শ্রেণীভিত্তিক সমাজের দ্বন্দ্ব অশান্তি নির্মুল করতে হলে শ্রেণীভেদ নির্মূল করতে হবে এবং ভবিষ্যতের মানবসমাজ গঠিত হবে মাত্র একটি বিরাট শ্রমিক সংঘকে নিয়ে। একই সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে তুলে ধরেছেন।

তাঁর লেখালেখি বেশি ছিল ইউরোপকেন্দ্রিক, তা বলে তিনি জনবিচ্ছিন্ন ইঙ্গবাদী ছিলেন না, তিনি সব সময় ভারত ও ভারতের পাঠকদের কথা ভেবেছেন। বাংলার নবজাগরন নিয়ে তিনি সারাজীবন ভেবেছিলেন। তিনি উনিশ শতকীয় বাংলার নবজাগরনের কিছু সীমাবদ্ধতআ যেমন- বিদেশী শাসকদের শোষনের প্রতি বাঙালির অজ্ঞতা, সাধারন মানুষের কাছে উচ্চ শ্রেণীর দূরত্ব, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সমাজকে দুর্বল করে তুলেছিল।

কিন্তু সংস্কৃতি গঠনে এই আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিহার্য। বাংলার নবজাগরন সম্বন্ধে যেমন অনেক প্রশ্ন তুলেছেন তেমনই তার উত্তরও দিয়েছেন।

পাঠকবর্গের সুবিধার্থে তিনি এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করে গেছেন, ইউরোপকে কেন্দ্র করে বিস্তর লেখালেখি করলেও ভারতীয় সমাজের সমস্যাগুলিকে কোনদিনই তিনি এড়িয়ে যাননি, উপযুক্ত সময়ে সঠিক উদাহরনের মাধ্যমে তিনি তার জবাব দিয়েছেন। সাম্যবাদ ও গনতন্ত্র এবং সমাজবাদী রাজনীতি ও বিজ্ঞানের প্রতি ছুড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ- যার মোকাবিলা করাকে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করতেন। তিনি নিজে কখনই মার্কসবাদকে প্রচার করতেন না তিনি খুব সহজ, নৈর্ব্যক্তিকভাবে মূল ঘটনাপ্রবাহকে তুলে ধরে বিভিন্ন কাঠামোর মধ্যে উন্মোচিত করে যেতেন।

ইতিহাসের মূল ঘটনাকে অপরিবর্তীত রেখে তথ্য যাচাই করে তা সঠিকভাবে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ফুটে ওঠে ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষন, আর এইখানেই ঐতিহাসিকের অবদান। সুশোভন সরকার একইভাবে সারাজীবন নিজ পেশার প্রতি দায়বদ্ধ থেকে ইতিহাসকে বোধগম্যতায় নিয়ে এসেছিলেন নতুন রূপ। তথ্য সংগ্রহ এবং তা থেকে ইতিহাসকে সঠিক পথে পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে তিনি ইতিহাসকে করেছেন আরও সমৃদ্ধ। যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে ইতিহাসের আসল স্বরূপ উদঘাটন করে সাধারন খেটে খাওয়া মানুষদের ইতিহাস রচনায় তিনি মগ্ন ছিলেন। আর এইখানেই ছিল তার ঐতিহাসিক রূপে সার্থকতা।

উপসংহার

সুশোভন সরকার বলতেন ‘যদি এক মিনিট পড়ো দশ মিনিট ভাবো। এই ছিল তাঁর ইতিহাস দর্শনের মূল কথা। ছেলেমেয়েদের স্তম্ভিত করে দেওয়ার চেষ্টা তিনি করেননি, কিন্তু ইতিহাস বোঝা এবং বোঝানোর ক্ষেত্রে চেষ্টা সবসময় তিনি করতেন। ইতিহাসের জটিল সমস্যাগুলিকে তিনি সরল করে আনতেন। সমস্যাগুলিকে অনেক ভাব্লে যে জ্ঞান আসে সে জ্ঞান তার ছিল। জটিল সমস্যাগুলিকে ছোট ছোট করে ভাগ করে নিয়ে আলোচনার পর অত্যন্ত সহজভাবে তা সাজিয়ে দিতেন। ইতিহাসের অনেককিছুই আমরা জানিনা, সেই না জানাটুকু স্বীকার করে নিয়ে যেটুকু বাকি থাকে সেটুকুই সহজভাবে বলে যাওয়া ঐতিহাসিকের কাজ। এই শিক্ষাই পাওয়া গিয়েছিল অধ্যাপক সুশোভন সরকারের কাছ থেকে।

বিংশ শতাব্দিতে সাতের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে মাতৃভাষা বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চার এক নতুন উদ্যম শুরু হয়। এই প্রয়াসের চালিকা শক্তি ছিলেন সুশোভন সরকার। ১৯৭৭ সালে সংঘ পরিবারের চাপে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রখ্যাত কিছু ঐতিহাসিকের লেখার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সাহসী প্রতিবাদ জানিয়ে প্রবিন্ধ লিখতে শুরু করেন সুশোভন সরকার। তিনি বলেছিলেন তার ছাত্রদের-“ তোমরা পশ্চিমবঙ্গে একটি ইতিহাসের সংগঠন তৈরি করো যা বাংলা ভাষায় ধর্মনিরপেক্ষ, বিজ্ঞান্সম্মত ইতিহাস চর্চার কেন্দ্র হবে”- এই প্রেক্ষাপট থেকেই তৈরি হয়

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ। তিনি বলেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের দরজা দলমত নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক সমস্ত ইতিহাস অনুরাগীদের জন্য খোলা রাখতে।

১৯৬০-এর দশকে অধ্যাপক সরকার তাঁর সন্তানদের সহায়তায় একাধিক ঘরোয়া মঞ্চ – প্রথমে জনশিক্ষা পরিষোদ এবং পরে মার্কস ক্লাব তৈরি করেছিলেন। ১৯৮০-এর দশকে বাম ও গনতান্ত্রিক যদি সম্ভবপর হয়ে ওঠে তা সম্ভব হয়ে উঠেছিল সুশোভন সরকারের জন্য। পরে দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দলীয় মতান্তর দেখা দেয়। ভারতে মার্কসবাদী চিন্তার একটি গনতান্ত্রিক ও সক্রিয় পরম্পরা নির্মাণের কাজে ডি ডি কোশাম্বী ও পি সি জোশীর মতো মানুষদের সঙ্গে সুশোভন সরকারও একই সারিতে স্মরনীয় হয়ে থাকবেন।

গ্রন্থপঞ্জী

১) “Essay in Honour of Sushovan Sarkar”, People Publication House, New Delhi, 1976.

২) দাশগুপ্ত অশীন, আরব সাগর-১৫০০-১৮০০, সুশোভন সরকার স্মারক বক্তৃতা, ১৯৯৬।

৩) ঘোষ শ্যামলকৃষ্ণ, ‘পরিচয়ের আড্ডা’ কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, জুন,১৯৯০।

৪) “পরিচয়” ১ম বর্ষ,৩য় সংখ্যা,মাঘ ১৩৩৮।

৫) “পরিচয়” ২য় বর্ষ, ১৩৩৯ ।

৬) “পরিচয়” ৩য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবন- ১৩৪০।

৭) “পরিচয়” ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা মাঘ ১৩৪২।

৮) সরকার সুশোভন, “বাংলার রেনেসাঁস”, কলকাতা, ১৩৯৭

৯) সরকার সুশোভন, “ ইতিহাসের ধারা”, মনীষা, কলকাতা, ১৯৪৪।

১০) সরকার সুশোভন, “ইতিহাস চর্চা”, নবার্ক, কলকাতা, ১৯৮৫।

১১) সরকার সুশোভন “ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ”, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুন, ১৯৮২।

১২) সরকার সুশোভন, “ প্রসঙ্গ ইতিহাস” নাভানা, প্রিন্সেপ স্ট্রীট,কলকাতা, জুন ১৯৮৩।

১৩) সরকার সুশোভন, “ মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ”, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক প্রকাশিত, ১৯৩৯।

১৪) সরকার সুশোভন “ Towards Marks”, Papyrus, Calcutta, 1985.